KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণিকা চন্দ্র ব্যানার্জি, কলকাতা ১৬
Collection : KLMLGK	Publisher বীর ওরাওন
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৫২/১ ৫২/২ ৫২/৩ ৫২/৪	Year of Publication বৈশাখ ১৩৯৮ ॥ May 1991 জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮ ॥ Jun 1991 আষাঢ় ১৩৯৮ ॥ July 1991 শ্রাবণ ১৩৯৮ ॥ Aug 1991 Condition : Brittle Good
Editor : অরুণ ঠাকুর	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫২ সংখ্যা ২ জুন, ১৯৯১

সূচিপত্র

বঙ্কিমচন্দ্রের ১৫৩তম জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁর কৃতির আধুনিক-প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে নানামুখী বিশ্লেষণ করেছেন মনীষী গোপাল হালদার।

কেতকী কুশারী ডাইসনসূচিত ভিকতোরিয়া ওকাম্পোকেন্দ্রিক রবীন্দ্রগবেষণার অভিনব ধারার পর্যালোচনা করেছেন গোরী আইয়ুব।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বিরল-আলোচিত রবীন্দ্র-নজরুল একটি সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন তথ্যনিষ্ঠ—গোপালচন্দ্র রায়।

"অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা"—সংগ্রহণপর্বে এবারের আলোচ্য বিষয়—মনোথীইজম, ডীইজম, থীইজম, নাস্তিক্যবাদ, তাওইজম এবং কনফিউশিয়ানিজম।

বাঙলার জনজীবনে চণ্ডীমণ্ডপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে একটি গবেষণাধর্মী, তথ্যসমৃদ্ধ সন্দর্ভ — "বাঙলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্বে চণ্ডীমণ্ডপ"।

রামমোহনের মূল্যায়ন নিয়ে বিতর্ক।

সেই কবি যার কণ্ঠ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় বেরিয়ে আসত মাটির কাছাকাছি মানুষের গান, ধর্ম আর রাজনীতির ধ্বজাধারীদের ফরমায়েশমত গান লিখতে না পারায় তার জীবনে ঘনিয়ে এল যে মর্মন্তুদ ট্রাজেডি—তাই নিয়ে এবারে গল্প।

সমাজতন্ত্রের মহিমা কি ম্লান? গ্রন্থ-সমালোচনা প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্ন।

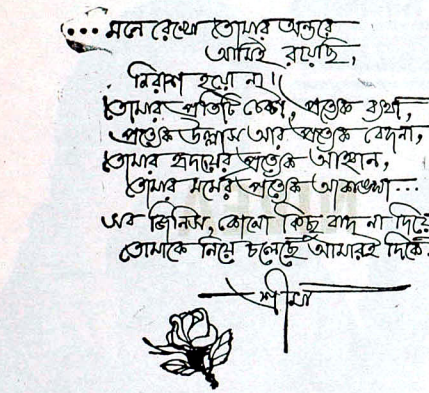

বর্ষ ৫২। সংখ্যা ২
জুন ১৯৯১
জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৮

বঙ্কিম-প্রতিভা—আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা গোপাল হালদার ৯৩

রবীন্দ্র-গবেষণার এক অভিনব ধারা গৌরী আইয়ুব ১১১

রবীন্দ্র-নজরুল একটি সাক্ষাৎকার গোপালচন্দ্র রায় ১৩২

অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা অরুণা হালদার ১৩৮

সাংচুয়ারি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ১০৫

ভূ-স্বর্গ দেবী রায় ১০৬

কলকাতা কেমন আছে অসীম রেজ ১০৮

এগিয়ে চলেছি সৈয়দ সমিদুল আলম ১১০

যে আছে মাটির কাছাকাছি রকিবউদ্দিন ইউসুফ ১২১

গ্রন্থসমালোচনা ১৫১

আজহারউদ্দীন খান, সনাতন মিত্র

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ১৬১

বাঙলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্বে চণ্ডীমণ্ডপ অরবিন্দ সামন্ত

মতামত ১৭৩

রঘুনন্দন গুপ্ত, অলোক রায়, দিবাকর চৌধুরী, নরেন সরকার

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন: ২৭-৬৩২৭

সম্প্রতি প্রকাশিত / পরিবর্ধিত সংস্করণ

॥ সম্প্রতি প্রকাশিত ॥

রবীন্দ্র-উপন্যাস-সংগ্রহ	মূল্য ১৪০.০০
মন্ত্র · কবিতা · গান	মূল্য ১৫.০০

॥ পরিবর্ধিত সংস্করণ ॥

রবীন্দ্রজীবনী ৩	মূল্য ১৪০.০০
স্ফুলিঙ্গ	মূল্য ৩২.০০, ৪০.০০
ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা	মূল্য ২১.০০

•

স্বরবিতান

৬২ খণ্ড প্রকাশিত। সব কটি খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে।

স্বরবিতান ৬৩

রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপির এই নতুন খণ্ডটি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

•

রবীন্দ্র-রচনাবলী সুলভ সংস্করণ

১৫ খণ্ডে সমাপ্য। এ পর্যন্ত ১২ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। বাকি খণ্ডগুলি প্রতি তিনমাস অন্তর প্রকাশিত হবে; এটাই প্রত্যাশিত।

সীমিত-সংখ্যক নতুন গ্রাহক নেওয়া হবে। **বিশ্বভারতী কার্যালয়ে** সত্বর যোগাযোগ করুন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কার্যালয় : ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭
বিক্রয়কেন্দ্র : ২ কলেজ স্কোয়ার। ২১০ বিধান সরণী

বঙ্কিম-প্রতিভা—আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা

গোপাল হালদার

ভূমিকা

বঙ্কিমমানস আমাদের কাছে দুর্বোধ্য নয়। তাঁকে নাকি শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশ্ন করেছিলেন, 'বঙ্কিম বাঁকা কেন।' বঙ্কিম উত্তর দেন, 'গুঁতোর চোটে।' এই কথাটুকুর ব্যঞ্জিত অর্থ হতে পারে—তাঁর কর্মক্ষেত্রের উপরওয়ালা ইংরাজ-মনিবের গুঁতো। কিন্তু সেই নির্গলিত অর্থ ছাড়াও একটা নিহিত অর্থ থাকাও সম্ভব। সেটা হল বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বের অপরিমেয়তা। এবং অনন্তধর্মিত্ব। এই-প্রকার মনোজীবন সতত দ্বন্দ্বসঙ্কুল না হয়ে পারে না। আর, এই দ্বন্দ্বসঙ্কুলতা তাঁর বিশেষ-বিশেষ চরিত্রে প্রকটিত। সংঘর্ষের ক্ষেত্র পারিবারিক, সামাজিক, আর্থ-রাজনৈতিক—সব মিলিয়ে। বঙ্কিম-ব্যক্তিত্ব সেখানে পড়তে-পড়তে উত্থিত হয়, এবং উত্থিত হতে-হতে পতিত হয়। বঙ্কিম প্রসঙ্গে আমাদের যোগশাস্ত্রোক্তি না মনে হয়ে পারে না: 'চিত্তনদী উভয়তো বাহিনী—বহতি চ পাপায়, বহতি চ পুণ্যায়।' সবচেয়ে বড়ো কথা: এই দ্বন্দ্বসমাকীর্ণ মনো-জীবনের কথা তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। তিনি বার-বার নীড়ে ফিরে এসেছেন। সেই নীড়েই তিনি মহীয়সী-পত্নীসকাশে আশ্রয় এবং শান্তি পেয়েছেন। এই কৃতজ্ঞতা তাঁকে ওয়ার্ডসোয়ার্থের নীড় আর আকাশের মধ্যে যাতায়াতের পথ অব্যাহত করে দিয়ে গেছে। এই আকাশের পথ ধরে তিনি পরিক্রমণ করেছেন ইতিহাস, -রাজনীতি, অর্থনীতি -মূলক সাহিত্যকথায় তথা প্রবন্ধে। অপর দিকে, তাঁর পরিণত মানস ফসল সর্বদাই সঞ্চিত হয়েছে নীড়ের নিভৃতিতে, সুগঠিত গৃহদুর্গের অন্তরালে মানব-মানবীর মর্মজীবনের মণিকোঠায়। এই দুইটি মূল প্রেরণাকে জাগাতে এবং স্থায়ী ধ্রুবপদে পরিণত করার প্রয়াসেই তিনি তাঁর প্রতি উপন্যাসে এনেছেন অস্থায়ী পার্শ্বচরিত্র। তাদেরও সংখ্যা কম নয়। তাদের মধ্যে একটা কোথাও সহজাত প্রবণতা আছে—ভালোলাগার এবং ভালোবাসার—ঘর বাঁধার। মানবীয় ভুলত্রুটিকে বঙ্কিম উপেক্ষা করেন নি। জীবনের অসংখ্য স্খলন-পতন মানবচরিত্রের সহজাত হলেও একমাত্র উপাদান নয়। মানবচরিত্রে সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব সতত দৃশ্যমান। এই দ্বন্দ্ব-চেতনার সামূহিক পটভূমিকাই মানবচরিত্রের প্রধান সম্পদ। সম্পন্ন এ চেতনাই মানবিক আধুনিকতা।

বঙ্কিমপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য—তার অনন্তমুখী প্রসারতায় প্রায় পঞ্চাশ বৎসর

কাল বঙ্গভারতীর আকাশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এত কথা বলা হয়েছে এবং এত কথা বলার আছে—এখনও সে বিষয়ে নূতন প্রয়াস করা আজ শক্ত বলে মনে হয়। তবুও ক্লাসিক সাহিত্য তথা ক্লাসিক সাহিত্য-রচয়িতার কিছু বিশিষ্টতা থাকে। বার-বার তা পড়া যায় এবং বার-বারই কিছু নূতন কথাও মনে এসে যায়। আমাকেও আজ সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হবার ফলে সেই পরম সত্যের উপলব্ধির সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমার মনে হয়—বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ কিংবা বিশ্ব-সাহিত্যে শেকসপীয়র সতত মানবমনে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকাল ১৮৩৮ থেকে ১৮৯৪ পর্যন্ত। ১৮৩৩ পর্যন্ত আমরা রামমোহন এবং তাঁর পরবর্তী আলোকশিখা পেয়ে যাই। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ১৮২৭-১৮৯৪ এবং ডিরোজিও ১৮০৯-১৮৩১ সময়সীমায় বর্তমান। ১৮৩৬-এ গদাধর চট্টোপাধ্যায় তথা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস জন্মলাভ করেন। তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৮৮৬ সালে। ১৮২০ সালে জন্মলাভ করেন বিদ্যাসাগর। তাঁর মৃত্যু ঘটে ১৮৯১ সালে। ১৮৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়—মধুসূদন দত্তের মৃত্যু হয় ১৮৭৩ সালে। ১৮৬৩ সালে বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাহলে আমরা এইভাবে আধুনিকতার একটা জন্মসূত্র এবং বিকাশ প্রত্যক্ষ করছি একটা বৃহৎ পটভূমির মধ্যে। ডিরোজিও থেকে তার আরম্ভ ধরলে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ পর্যন্ত সে ভাবনা-প্রগতি এগিয়ে এসেছে। মাঝখানে আরো যুগোপযোগী বহু প্রতিভার সংঘর্ষ-সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে আমরা বঙ্কিম-মানস, বঙ্কিম-প্রতিভাসহ সমগ্র বঙ্কিম-ব্যক্তিত্বকে খানিকটা মাত্র অনুভব করতে পারি। প্রসঙ্গত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কথাটিও স্মরণীয়। তিনি ১৮১২-১৮৫৯ সালের মধ্যে যে সাংবাদিকতার সূচনা করেন বঙ্কিমজীবনে মনে হয় সেই অবদান স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান।

বঙ্কিম-প্রতিভার বলিষ্ঠতা এই দ্বন্দ্বসমুৎকীর্ণতায় আধারিত। তাঁর অপরিমেয় জিজ্ঞাসা, অশেষ আকুতি এবং অপরাজেয় বোধি তাঁকে ইউরোপীয় সাহিত্যের পুরোধাদের কাছাকাছি এনেছে। যাঁরা এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্যিকদের মননসমীক্ষা নিয়ে আজকের দিনে আলোচনা করেন, তাঁদের কাছে বঙ্কিম-মানস অপরিচিত বোধ হবে না।

ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার যে ভাবনা নিয়ে ভারতীয় তথা বাঙালি রেনেসাঁসের পর্যালোচনা করেছি, তার কিছু-কিছু পরিবর্তন জীবনের গতিতে আজ পরিবর্তিত হতে পারে বলে প্রতিভাত হয়েছে। কিন্তু নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখলে বঙ্কিম-চরিত্র আমাকে ডেনমার্কের রাজপুত্র হ্যামলেটকে মনে পড়িয়ে দেয়। বঙ্কিম স্বীয় চেতনাভারে সতত আলোড়িত-আন্দোলিত, অথচ তাঁর চিন্তা রোমানটিক বেদনায় নমনীয়। আবার গুণগতভাবে সেই রোমানটিক চিন্তাধারার বাহক এবং ধারক হয়ে আছে এক বিশিষ্ট ক্লাসিক রীতি। এই ক্লাসিক রীতির জন্য বঙ্কিম পুরাতন হন না—'পশ্য দেবস্য কাব্যং যো ন জীর্যতে।' অথচ শেকসপীয়রীয় দ্যোতনা বঙ্কিমের মধ্যে নেই। তৎকালের পরিপ্রেক্ষিতে তা থাকতেও পারত না। বঙ্কিমরীতি অনুসৃতি বা অনুকৃতি নয়, এমনকী স্টটেরও নয়। তবুও সুপরিণত বয়সে বঙ্কিম পড়তে গেলে এখনও, কেন জানি না, আমি শেকসপীয়রের স্বাদগন্ধ পাই। ইয়োরোপীয় অর্কেস্ট্রার মতো মহাজীবনের একটা প্রবাহ বঙ্কিমের বিশিষ্টতা। আমাদের আধুনিক চিন্তা-ভাবনার মধ্য দিয়ে যে বঙ্কিম-ভাবনা উৎসারিত, সে বঙ্কিমকে নানা দিক দিয়ে শেলাঘাত করলেও বঙ্কিম একটা বড়ো কঠিন শিলাস্তরের মতো প্রতিষ্ঠিত থাকেন। যে-কোনো ক্লাসিক রচনা কখনো পুরাতন হয় না, এবং সতত নূতনভাবে আলোচিত হবার অপেক্ষায় থাকে। বঙ্কিম-রচনার প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে আমিও তাই মনে

করি—প্রতিটি রচনাই পুনরালোচিত হতে পারে। আধুনিকতার শাণিত অস্ত্রের সবকটিই সেখানে প্রযুক্ত হলেও বঙ্কিম দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর সমগ্র রচনা পাঠ করলে মানতেই হয় বঙ্কিম এক বহুশ্রুত, অধ্যয়নশীল পুরুষ ছিলেন। তৎকালে যতটুকু বা যেভাবে সম্ভব দেশী-বিদেশী পুস্তক-সম্ভার তাঁর লক্ষ্য এড়াতে পারে নি। ইয়োরোপীয় রোমানটিক সাহিত্য, তৎকাল-প্রচলিত দর্শনচিন্তা তিনি গভীরভাবে অনুশীলন করেছিলেন। সে অনুশীলন ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর রচনায়। এইখানেই তাঁর অন্য ভাবধারাকে আত্মসাৎ এবং আত্মীকরণের সফলতা। 'বহুজনহিতায় চ, বহুজনসুখায় চ' কথাটা মানুষ-বঙ্কিম গোঁড়ামি দিয়ে ব্যবহার করেন নি। এটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর রচনায় মৌলিকতার সৌষ্ঠব সাধন করেছে। অপর দিকে, তিনি একটা পুরাতন কৌশলকে তাঁর কাজে লাগিয়েছেন। লক্ষ করলে মানতেই হয় যে, সকল দেশেই প্রায় প্রথম যুগের রচনা ধর্মাশ্রিত না হয়ে পারে নি।

ধর্মসাহিত্যই শেষমেশ ধর্মের ধ্বজা ত্যাগ করে মানবসাহিত্যের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হয়েছে। আমার ঠিক জানা নেই যে, বঙ্কিমরচনাকে কেউ এদিক দিয়ে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে আলোচনা করে দেখেছেন কিনা। এখন যদি আমরা সেই দৃষ্টিতে তাঁকে লেখক এবং ব্যক্তি হিসাবে দেখি, তাহলে খুব বিস্মিত বা হতাশ হব না—এমন মনে হয়। তাঁর লেখাকে তার বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনা সত্ত্বেও অনেক সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর রচনা ইয়োরোপীয় য়চনার অনুকরণ, তাঁর লেখায় অনর্থক নৈতিকতার স্পর্শদোষ, তাঁর লেখায় মানব-মানবীর প্রেমকে সামাজিক নিকষের কষ্টিপাথরে যাচাই না কয়ে পাসপোর্ট দেওয়া যায় না। অবাঞ্ছিত প্রেম তথা প্রেমপাত্র মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয় নৈতিকতার বলি হিসাবে—এমনতর আলোচনা বঙ্কিমপ্রতিভাকে এতাবৎ আক্রমণ করে এসেছে। একটু নিরপেক্ষ দ্রষ্টা হিসাবে দেখলে বোঝা যাবে যে, বঙ্কিম আধুনিকতার পুরোধা হিসাবে পূর্বোক্ত যে-সকল দ্বন্দ্বসমস্যার অবতারণা করেছিলেন, তার শেষ এখনও ঘটে নি। ঘটতে তা পারে না—বাস্তবে তা এমনই জিনিস। বঙ্কিমমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা না করেও তাঁর এই অসামান্য মহত্ত্বকে মনুষ্যত্ববাচক বলেই আমাদের মনে হয়।

বঙ্কিমভাবনা সমাজচেতনায় প্রবুদ্ধ

মানুষ বা হোমো স্যাপিয়েন সতত সমাজবদ্ধ জীব। এই একত্রাবস্থানের নিয়মনীতি তাকে যুক্তি আর বিবর্তনের পথ ধরে আয়ত্ত করতে হয়েছে। (অথবা, কারো-কারো মতে, এটা সে এক ধরনের অশিক্ষিত-পটুত্ব হিসাবে বা ইনস্টিংক্ট হিসাবে পেয়েছে তার জান্তব উত্তরাধিকার হিসাবে।) সাধারণভাবে এই নিয়ম একটা শৃঙ্খলা আনে। মানুষের কূটকৌশল সেই শৃঙ্খলাকে যে শৃঙ্খলে পরিণত করতে পারে, সেটা ভারতীয় সমাজ দেখলে বুঝতে দেরি হয় না। তথাকথিত আর্যজাতি এদেশে এসে কীভাবে মিশ্র হিন্দু জনে পরিবর্তিত হয়, সে আলোচনা তোলা এখানে বাহুল্য মাত্র। বর্ণাশ্রম ধর্ম হিসাবে গৃহীত হয় কোনো-না-কোনো ভাবে কিছু মানুষকে নিগৃহীত করার জন্য এবং কিছু মানুষকে সুবিধা পাইয়ে দেবার জন্য। বর্ণাশ্রম নীতিগত সংস্কার হলেও কালে-কালে সেটা একরূপ অপরিত্যাজ্য ধর্মের রূপ গ্রহণ করে। ভারত ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বর্ণবৈষম্য নিশ্চয় আছে, সাদা কালো পীত মানুষের মধ্যে। তবে সবচেয়ে বড়ো ভেদ হচ্ছে দুইটি শ্রেণীর অর্থগত কৌলীন্য প্রাধান্য এবং তার অভাব। এ ছাড়া, একটা সর্বসাধারণীকৃত বিভেদও আছে, সেটাও নীতিগত—ভালো এবং মন্দের বিভেদ কোনো-না-কোনো ভাবে সর্বদেশে সর্বকালে মেনে নেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষে তার একটা শ্রেণীগত চরিত্র গড়ে উঠেছে ধর্ম আর অধর্মের নাম দিয়ে। এই ধর্ম আর অধর্মকে মানবমন নানা

যুক্তির কৌশলে প্রচারে প্রায় বিপরীতবোধের সংজ্ঞায় পরিণত করেছে বলা যায়। এই দৃষ্টি দিয়ে দেখলে আমরা ছবিতে নরকদর্শন, মানবের দশদশা, কর্মফল প্রভৃতির মতো একটা ভয়াবহ চিত্র যেন মনে দাগ দিয়ে এঁকে নিই। এমন পারিপার্শ্বিক বা আবহাওয়া ভারতে কুসংস্কারের স্থায়ী রূপ রচনায় সাহায্য করেছে।

পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে বিচার করলে আমরা দেখি, বঙ্কিম অনেকাংশে এরূপ মনোভাবের শিকার। তাঁর উপন্যাসে তাঁর আত্মপ্রক্ষেপ, অথবা যাকে বলে সেলফ-প্রজেকশন, তা আছে। সেই পথে বঙ্কিম-মানস একদিকে ভোগী এবং অপরদিকে সেই ভোগ-জনিত একটা অপরাধবোধে কাতর। তাঁর গ্রন্থে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে স্বাভাবিক অনুরাগ জাগ্রত হলেও তা শেষ পর্যন্ত স্থায়ী সম্মান পায় না। (আয়েষা ও জগৎ সিংহের প্রেম, আলমগীর-ইমলি বেগমের সখ্য তুলনীয়) সম পর্যায়ের প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমও সার্থকতাভিমুখী হয় না। সেখানেও অপরাধবোধ থেকে যায়। (কুন্দনন্দিনী-নগেন্দ্রনাথের প্রেম, প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রেম তুলনীয়)। অনেক-ভাবে অপ্রাকৃত দৃশ্য এনে অথবা কোনো মনো-বৈজ্ঞানিক ফ্রী-অ্যাসোসিয়েশন পদ্ধতির আশ্রয় নিয়ে বঙ্কিম তাঁর পাত্রপাত্রীদের একপ্রকার চিকিৎসা করান। এ বিষয়েও বঙ্কিম অতুলনীয়ভাবে আধুনিক। চন্দ্রশেখর যেভাবে পত্নী শৈবলিনীর বাল্যপ্রেমের চিকিৎসা করেছেন তা বিংশ শতকের মনোবৈজ্ঞানিক সাধনপ্রণালীর অনুরূপ বলা যায় বইকি। আরো দেখা যাবে, তাঁর চরিত্রগুলি (রোহিণী-গোবিন্দলাল, অমরনাথ-লবঙ্গ) কী নির্মমভাবে তাঁর হাতে নিগৃহীত। এসব স্থানে তিনি এক ধরনের ব্যবস্থা দেন—সেটা হয় মৃত্যু (রোহিণী) আর না হয় সন্ন্যাস (গোবিন্দলাল-অমরনাথ)। তাঁর চরিত্রগুলি এমনভাবে কোথাও-কোথাও নিয়ন্ত্রিত যে তাতে করে শৈল্পিক মাত্রাবোধও ক্ষুণ্ণ হয়। তাঁর কাছে শাস্ত্র-সম্মত বাল্যবিবাহ নিন্দনীয় নয় (পশুপতি, মনোরমা, পুরন্দর) অপরদিকে বহুবিবাহও সামাজিক স্বীকৃতি-প্রাপ্ত (সীতারাম, রাজসিংহ, রজনী, দেবী-চৌধুরানী)। অথচ মানব-মানবীর পারস্পরিক সহজ আকর্ষণের তীব্রতাকে তিনি এক ধরনের অপরাধ বলে মনে করেন। তা নাহলে লবঙ্গ-অমরনাথের প্রেম কেন নিন্দনীয় তা বোঝা যায় না, বিমলা বীরেন্দ্রসিংহের পত্নীর মর্যাদা কেন পায় না, তা আশ্চর্যভাবে বেদনাকর। সন্ন্যাসীরাও মানুষ। আদর্শ-বাদের সত্যত্বকে যাচাই করলে মনুষ্য হিসাবেই ব্রতী মানুষকে দেখতে হয়। বঙ্কিম তা দেখেন না। আদর্শ ভাঙার অপরাধে বলি হতে হয় ভবানন্দকে এবং প্রতাপকে। অপরদিকে পশুপতির মৃত্যু এক ধরনের কর্মফলপ্রাপ্তি বলে তিনি মনে করেন। মনোরমা যাই হোক, সে সহমরণে যায়। বিধবার পক্ষেও অবশ্য একথাই সত্য যে তাদের প্রেম কখনও সার্থকতাপ্রাপ্ত হবে না। কুন্দনন্দিনী এবং রোহিণীর মৃত্যু তাই বঙ্কিমের লেখনীতে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। আমরা সত্যই খুশি হতাম যদি বঙ্কিমকে কেবল-মাত্র পূর্বোল্লিখিত একদেশদৃষ্ট মনোভাবের লেখক বলে নিশ্চিত হতে পারতাম। কিন্তু বঙ্কিম তো তা নন। বঙ্কিম শিক্ষিত আধুনিক মানুষ। তিনি ইংরাজির মাধ্যমে তৎকালপ্রাপ্ত ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেকখানি অংশের সঙ্গে পরিচিত। ইংরাজি সাহিত্য এবং ইয়োরোপীয় দর্শন তথা নির্মোহ যুক্তিবিজ্ঞান তিনি আস্বাদ করেছেন শুধু তাই নয়, কার্যত অনুশীলন-পরিশীলনও করেছেন। সেই কারণেই তাঁর নায়ক-নায়িকা এবং অন্যান্য চরিত্র প্রেমে পড়ে। এ প্রেম ঠিক এদেশের রাধাকৃষ্ণপ্রেমের পর্যায়ভুক্ত নয়। বঙ্কিম তাঁর চরিত্রের মধ্যে যে প্রেমের আস্বাদ এনেছেন তাতে রোমানটিক প্রেমের স্বাদ পাওয়া যায়। সে প্রেমের সঙ্গে বাস্তবে সেই সময় বিরোধিতা জাগার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। রোমান্স এবং রিয়লিটির দ্বন্দ্বে সংঘর্ষে বঙ্কিমসৃষ্ট চরিত্রেরা ক্ষতবিক্ষত হয়। অবশেষে তারা হয় মৃত্যুবরণ করে, নয়তো গ্রহণ করে সন্ন্যাস। বঙ্কিম তখন আর জীবনশিল্পী থাকেন না। নিজস্ব স্ববিরোধের শিকার হয়ে চরিত্র-গুলিকে হনন করার মধ্যে একপ্রকার আত্মহননের স্বাদ পান। বোঝা যায়, ইয়োরোপীয় জীবনবোধ এবং তাঁর ভারতীয় জীবনবেদের মধ্যে কঠিন অসমন্বয় বর্তমান। আর, উপযুক্ত কারণেই যেখানে বঙ্কিম তাঁর সুপ্রচলিত উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রধান-প্রধান চরিত্র-গুলির প্রসাধন করতে গেছেন, সেখানেই তিনি একপ্রকার ব্যর্থ হয়েছেন। অপর পক্ষে, পার্শ্বচরিত্র-গুলি উপন্যাসের পক্ষে শুধুমাত্র প্রসাধক হয়ে ওঠে নি—সেগুলির দ্বারাই উপন্যাস পুষ্ট হয়েছে, রসাশ্রিত হয়েছে, এবং প্রসন্ন এক ব্যঞ্জনা প্রাপ্ত হয়েছে। এই প্রসন্নতা এসেছে একপ্রকার সমন্বয় দ্বারা—এ সমন্বয় তাঁর মর্মানুভূতি। সেই সমন্বয়ের মধ্যে তাঁর বিবেক-বোধ এবং যুক্তি সমন্বিত হয়। তিনি স্বস্তি পান এবং সংঘর্ষ এড়াতে পারেন। এর মধ্যে দিয়ে দেখি—প্রফুল্ল আর দেবী চৌধুরানী থাকে না। রাধারানী আর ইন্দিরা ঘর-বর খুঁজে পায়। বাস্তব ঘটনা প্রায় অবাস্তব হলেও তারা যেন অদৃষ্টের সহায়তা পায়। আশা করা যায় জীবানন্দ-শান্তি বানপ্রস্থ অবলম্বনে প্রকৃত শান্তি লাভ করবে এবং জগৎসিংহ-তিলোত্তমা সুখে ঘরকরনা করবে। এই ব্যবস্থাপনা নিশ্চয়ই শিল্পসম্মত নয়।

তাহলেও আমরা বলতে পারি না যে, বঙ্কিম-সাহিত্যের চরিত্রে কী নারী কী নর—সকলেই তাঁর লেখনী দ্বারাই শুধু নিয়ন্ত্রিত। সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলার কাঠিন্যের মধ্যেই সহজ মানবিকতা প্রকাশ পায় বলেই রোহিণী বিধবা হয়েও হরলাল অথবা গোবিন্দলালের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে। ভ্রমরকে ঈর্ষাপীড়িত করে। আবার তীব্র জীবনবোধের জন্যই সে মরতে চায় না, অপর পুরুষকে আশ্রয় করেও বাঁচতে চায়। এই বাস্তব ভাবনা বঙ্কিমের সহানুভূতি পায় না। হীরা চরিত্রও তদনুরূপ। সে অবশেষে পাগল হয়ে যায়। এ দুটি চরিত্রের কাছাকাছি যায় জেবউন্নিসার চরিত্রও। তবে তার কষ্ট বঙ্কিম বেশি ব্যক্ত করেন নি। ভ্রমর, রোহিণী কিংবা মনোরমা (তাঁর খেয়ালিপনা সত্ত্বেও) বিমলা, শান্তি কিংবা শ্রী, প্রফুল্ল, নন্দা কিংবা আয়েষা—এঁরা কেউই দুর্বল ব্যক্তিত্ব নন। পাশ্চাত্য সাহিত্যে যে ব্যক্তিত্ব, নারীত্বও প্রকট—এঁদের প্রত্যেকের মধ্যেই কোনো-না-কোনো ভাবে সে ছায়ানুসরণ আমরা করি। বঙ্কিম কিন্তু তাদের জনক হয়েও তাদের ভালোবাসেন নি।

অন্যদিকে সম্ভবত বঙ্কিমের দ্বন্দ্বসমাকীর্ণ মনের অভিব্যক্তি আশ্রয় করে থাকে এক ধরনের স্বৈরাচারী পুরুষপ্রধান সমাজ-জীবনকে। এ সমাজ-জীবন তাঁর সময়কার পটভূমি এবং ভাবনার চালচিত্র বলা যায়। সেইসব অহং-সর্বস্ব "বাবু"-ভাবাপন্ন পুরুষদের সহ-চারিণী নারীরা সমমনস্কতার দাবি না করে তাঁদের ঘরের গৃহিণী—পুত্রকন্যার জননী হয়ে এক ধরনের কোমল ব্যক্তিত্ব বা কতিতাঙ্গ ব্যক্তিত্ব লাভ ক'রে সুখেদুঃখে ঘরকরনা করেন। তার মধ্যেও এক ধরনের আদর্শবাদ ঝলক দিয়ে যায়—সেও ভারতীয়-ভাবানুষঙ্গ-বিরোধী নয়। 'গৃহিণী সচিবঃ সখী প্রিয় শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ' কথাটা মনে রেখেই তিনি সূর্যমুখী চরিত্রের সৃষ্টি করেন। সেই চরিত্রের নিটুট স্বভাব রক্ষিত হয় নি। তিনি কুন্দর বিবাহ দিয়ে খুব সঙ্গত কারণে গৃহত্যাগ করেন। অপর পক্ষে, কমলমণি অসাধারণ আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা সত্ত্বেও খুব স্পষ্ট চরিত্র হতে পারে নি—'বালানাং রোদনং বলম্'—এই নীতি অনুসারে সে কান্নাকাটি করে জিততে চায়।

বঙ্কিমের পুরুষ-চরিত্রগুলি সর্বথা পৌরুষ-গুণসম্পন্ন হয় না। অমরনাথ, আলমগীর স্বয়ং এবং নবকুমারকে একপ্রকার মানুষ মনে হয়। অন্যরা প্রায় ছায়ামানব। নবকুমার সত্যই কপালকুণ্ডলার জন্য প্রতীক্ষমাণ। তাঁর সে প্রতীক্ষা সফল হয় নি। অপর পক্ষে, মতিবিবি একটি উৎকৃষ্ট বাস্তব চরিত্র। সুখে-দুঃখে

পোড়-খাওয়া জীবনবোধের মধ্যেও সে বাল্যবিবাহের পাত্র নবকুমারকে দেখে চিনতে পারে এবং অবশ্যই সঙ্গত কারণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কপালকুণ্ডলাও। কিন্তু এরূপ চরিত্র তৎকালীন বঙ্গ-সমাজে কদাচিৎ মিলবার কথা। বহুশ্রুত বঙ্কিমের রচনায় অনেক ক্ষেত্রেই শেকসপীয়রীয় রচনার ছায়া-পাত ঘটেছে। "কপালকুণ্ডলা"তে একাধারে আমরা মিরান্দা এবং ওফেলিয়াকে পেতে পারি। "যুগলাঙ্গুরীয়"তে আভাস জাগে "টুয়েলভথ নাইটে"র। "ইন্দিরা"র ঘটনা উপস্থাপনায় রামসদয় মিত্রের স্ত্রী এবং রাধুনী ব্রাহ্মণীর মধ্যে "টেমিং অভ দ্য শ্রু"র আভাস দেখা দেয়। নরচরিত্রগুলির মধ্যে অনেকেই কিছু কমপ্লেক্সগ্রস্ত।

বঙ্কিম-রচনার মধ্যে আর-একটি বড়ো আধুনিকতা লক্ষিত হয়। এ আধুনিকতা একপ্রকার নূতন রসের স্বাদ বঙ্গসাহিত্যে নিয়ে আসে, এমন মনে করা সঙ্গত হবে। এটি হল স্বচ্ছন্দ কৌতুকরস বা ইংরাজি হিউমার। এটি ফেনচ সারক্যজম নয়, সুইফটের স্ল্যানডারিং নয়, ব্যানটারিং নয়। ভারতীয় তথা বঙ্গ-সাহিত্যে ভাঁড়ামি থাকলেও এমন বিশুদ্ধ হিউমার আমরা অন্যত্র পাই না। এমনকী বিদ্যাসাগরের রচনাতেও নয়। বিদ্যাসাগর প্রতিপক্ষকে শ্লেষাত্মক যুক্তিতে পরাস্ত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বড়ো আশ্চর্যভাবে বিদ্যা-দিগ্‌গজের মুখে ভাষা দেন—চোখে জল আনেন এবং আশমানীসহ পাঠককে অনাবিল হাসিতে স্বচ্ছন্দ করেন। মনে রাখা দরকার, এরূপ হাস্যকৌতুক তাঁর সৃষ্ট ঘরোয়া চরিত্রেও পাওয়া যায়, আবার একটু নিম্ন-শ্রেণীর কাজের লোকদের মধ্যেও পাওয়া যায়। কিন্তু পরের দিকে আমরা দেখি "কমলাকান্ত" আর "লোকরহস্যে"র মধ্যে এই বিষণ্ণ কৌতুক বা হিউমার আরো স্পষ্টতর। মনে হয়, বঙ্কিম-মানস সেখানেই সমধিক স্থিতপ্রজ্ঞ।

বঙ্কিম-রচনার প্রাসঙ্গিক আধুনিকতা আলোচনা করতে গেলে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে তাঁর প্রবন্ধসম্ভারের বৈচিত্র্য, রসসমৃদ্ধতা এবং অবশ্যই বিদগ্ধ কৌতুক স্মরণ হয়। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর "কমলাকান্ত" বঙ্গসাহিত্যে এখনও একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলা যায়। তথাকথিত বেল লেতয়ের তা অগ্রদূত। এক আশ্চর্য জগতের পরিচয় আমরা সেখানে পাই। তাকে শুধু ডি কুইন্সের ছায়ানুসরণ বলা ভুল হবে। চিন্তার আধুনিকতা, যুক্তির সারতা যখন বাস্তব অসহায়তাকে স্বীকার ক'রে আপনাকে অভিব্যক্ত করতে পারে, শুদ্ধ কৌতুক তারই ব্যঞ্জনা। কাছাকাছি রচনাকারের মধ্যে আছেন ত্রৈলোক্যনাথ। তাঁর রচনাতেও আধুনিক বাগ্‌বৈদগ্ধ্য এবং সমকালীন সমাজসংসারের প্রতিফলন ঘটেছে। সেখানেও প্রসাদগুণ বর্তমান। কিন্তু, ত্রৈলোক্যনাথ মূলত তাঁর বেদনা এবং ক্ষোভ এবং সামাজিক অন্যায়কে এক ধরনের সিম্বলিজমের সাহায্যে যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, তাতে তাঁকে ইংরাজি হিউমারের চেয়ে যেনচ সারক্যজম বলা অধিক সঙ্গত। ইংরাজি হিউমারের একটি প্রসাদগুণ আছে—এটি এক ধরনের হাসতে-হাসতে কেঁদে ফেলা অথবা কাঁদতে-কাঁদতে হাসার অনুভূতি। আমাদের মনে হয়, বঙ্কিম-উপন্যাসের মধ্যে যা বলতে পারেন নি, তার অনেক-খানি ব্যক্ত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যের মধ্যে। অবশ্য "কমলাকান্ত" বা "লোকরহস্য"ই মাত্র তাঁর প্রবন্ধসংগ্রহ নয়। শুধুমাত্র ভালোলাগার নিরীক্ষায় ওই দুটিকে মাত্র এখানে উপস্থাপিত করা ঠিক হবে না।

অপরাপর প্রবন্ধের মধ্যে আছে "অনুশীলন", "কৃষ্ণচরিত্র" এবং "ধর্মতত্ত্ব"। এ তিনটির মধ্যে যদি কিছু সমজাতীয়ত্ব থাকে, তা হল তাঁর এক ধরনের বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসের যৌক্তিক উপস্থাপনা। তাঁর কোনো-কোনো উপন্যাসেও এরূপ প্রবল যুক্তি আত্মঘোষণা করেছে। "আনন্দমঠে"র 'নেড়ে মার', 'নেড়ে মার'—এই যুক্তি বা তত্ত্ব বঙ্কিম-মানসের দুর্বল উপস্থাপনা। অনেকে বলেন, এবং সে যুক্তিটা ঐক-দেশিক হলেও এখনও অনেকে তা স্বীকার করেন। সংশয় জাগে যে সত্যই কি বঙ্কিম স্বীয় অন্তরে এতখানি পরধর্মদ্বেষী হিন্দুবিশ্বাসী ছিলেন, নাকি নিজে সরকারি চাকুরিয়া বলে তিনি ইংরাজ শাসককে 'মুসলমান' নামের আড়ালে রাখেন?—এই যুক্তির ছদ্মবেশ কি বঙ্কিমের ছিল? আমাদের ধারণায়, যে কারণেই হোক, বঙ্কিম-ভাবনায় সর্বদাই একটা দ্বিমুখী স্ববিরোধ বাস করত। সেই কারণে তিনি "সীতারাম" উপন্যাসে উদয়গিরি-খণ্ডগিরির অপরূপ ভাস্কর্যের মধ্যে হিন্দু স্থাপত্যরীতির শত-শত প্রশংসা করেন। অপর পক্ষে, মুসলমান তরুণী আয়েষার প্রেম জগৎ-সিংহের গ্রাহ্য বলে মনে করেন না। তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে যদিও আমরা চাষি হিসাবে হিন্দু এবং মুসলমান উভয় চাষিরই নাম পেয়ে যাই—সেটা শুধুমাত্র উল্লেখই হয়ে থাকে। তাঁর রচনাতেও যেমন, বাস্তবেও তেমন, দুজনই অভুক্ত থাকে—শক্তের হাত থেকে অশক্তের লাঞ্ছনার পাত্র হয়ে। অনুরূপ নিয়মে তিনি বেন্থামের ইউটিলিটেরিয়ানিজমের তত্ত্বের অবতারণা করেন। সমসাময়িক ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যেটুকু অধ্যয়ন তাঁর আয়ত্তে ছিল, সেটি তিনি স্বদেশী বিড়ালের মুখে উপস্থাপিত করেছিলেন। কলুর ছেলে ভাত-মাছ খায়—শীর্ণ বেড়াল বলে মেও—অর্থাৎ দাও। শক্তির অপব্যবহার, কিছু মানুষের লোভ এবং বহু মানুষের ক্ষোভ তাঁর অজানা ছিল না। আমাদের আশ্চর্য লাগে যে, পরবর্তী যুগের ভারতীয় কংগ্রেসের দাবিদাওয়ার মধ্যে কি উক্ত প্রকার কলুর কাছে বিড়ালের প্রার্থনার ভঙ্গিই ছিল না? মনে প্রশ্ন জাগে—এটি কি তাঁর চোখে সেদিন ধরা পড়েছিল? বলা বাহুল্য যা মেলে তা সেই উচ্ছিষ্টেরই দুই-চার কণামাত্র। প্রত্যক্ষ রাজনীতি না করলেও যে-কোনো সৎ লেখকের রচনায় পরিদৃশ্যমান প্রাসঙ্গিক রাষ্ট্রভাবনার মতো বঙ্কিমের লেখাতেও আমরা সেরূপ ভাব নানাভাবে পেয়ে থাকি। এবং সবটাই শুধুমাত্র ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তার প্রতিফলন নয়—বঙ্কিম ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় তার খানিকটা প্রায়োগিক রূপ দেখতে চেয়েছিলেন।

বঙ্কিম-ভাবনা—অধ্যাত্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ধর্মানুশীলন

এদেশে শাস্ত্রের কথায় বলে ধর্ম ধার্মিককে ধারণ করে: 'ধর্ম রক্ষতি ধার্মিকম্' এবং 'ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্'। বলা বাহুল্য, আদিতে সকলপ্রকার সাহিত্যই একপ্রকার ধর্মসাহিত্য বা ধার্মিক সাহিত্যই ছিল। ক্রমে-ক্রমে ধর্ম এবং সাহিত্য পরস্পরের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করে। অন্য সব দেশের মতো এদেশেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বঙ্কিম-রচনায় প্রবন্ধ-রচনাগুলির একটা বড়ো অংশে এই ধর্মই বিষয়বস্তু। একদিকে তাঁর রচনাসমূহের যুক্তিনিষ্ঠতা, প্রবল আধুনিকতা এবং প্রবহমান প্রাসঙ্গিকতা, তাঁর ক্লাসি-ক্যাল উপস্থাপনা আমাদের আজও আকৃষ্ট করে। আমরা অনুভব করি তিনি স্বীয় আগ্রহে কোঁৎ, বেন্থাম, মিলের রচনা আহরণ এবং অধ্যয়ন করেন। বেন্থাম ও মিলের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান। বেন্থামের মত, বহুজনহিতায় যা তাই সুখ, এবং তাই শুভ। (গ্রেটেস্ট গুড ফর দ্য গ্রেটেস্ট নাম্বার।) তাতে করে দেখা গেল, যা বহুজনের পক্ষে সুখ, তা সর্বতোভদ্র বা শুভ নয়। সুতরাং, মিলের সংশোধনী হল ওই বহুজনার সুখ হলেই হবে না, তা সর্বতোভাবে ভদ্র বা শুভ হবে; তবেই তা গৃহীত হবার উপযুক্ত। তখনও প্রশ্ন ওঠে যে, এই 'শুভ' কথাটা বা সর্বতো-ভদ্র শুভ যে কী—তা কে স্থির করবে? এজন্য মিল ব্যবস্থা করেন কিছু গুণগ্রাহী লোক (বডি অব রেফারি) থাকবেন যাঁরা স্থির করবেন যে প্রকৃত সুখই প্রকৃত শুভ কিনা। বলা বাহুল্য, এ প্রশ্ন মীমাংসিত হয় নি, হওয়া সম্ভব নয় বলে। পরিণাম: সুখবাদের

স্থানে হেগেলীয় সম্পূর্ণতাবাদ বা বিশ্বকল্যাণবাদ তৎস্থানে স্বীকৃত হয়। বঙ্কিম শেষোক্ত সিদ্ধান্তে আসেন নি। তাঁর মতে, কঁতের পজিটিভিজম হল গ্রাহ্য তত্ত্বমীমাংসা। সেক্ষেত্রে নাস্তিকতাই ফলস্বরূপ পরিণতি হওয়া স্বাভাবিক হত। কিন্তু বঙ্কিমের ক্ষেত্রে তা হয় নি। কঁতের জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এল তাঁর ধর্মজিজ্ঞাসা। তাঁর মতে দাঁড়াল নীতিগতভাবে 'বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্যই সুখ' এবং তাই শুভ।

প্রসঙ্গত এখানেও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমের দ্বন্দ্বসংঘর্ষক্লিষ্ট মনন বা ভাবনালোক যুক্তিকে আশ্রয় করলেও ধর্মকে পরিত্যাগ করতে চায় নি বা পারে নি। সেই কারণে তাঁর পক্ষে প্রয়োজন হয়েছে ধর্মকে যুক্তির শক্ত আশ্রয়ে সংস্থাপিত করার। সেইজন্য লিখিত হয়েছে "কৃষ্ণচরিত্র" আর "ধর্মতত্ত্ব"। অনেকে বলেন, "কৃষ্ণচরিত্র" তাঁর মুখ্য রচনা। সেটা ঠিক বলে গ্রহণ করা শক্ত। কৃষ্ণ-বাসুদেব তাঁর কাছে শুধুমাত্র আরাধ্য দেবতাই নন, বঙ্কিম-মানসে সেই কৃষ্ণ আদর্শ পুরুষও। অথচ কৃষ্ণচরিত্রের উপলব্ধ যত রকম উপাদান সেই সময়েও সংগৃহীত হয়েছিল তার চাইতে বেশি কিছু উপাদান এখনও উপলব্ধ হয় নি। যুক্তিবাদ দিয়ে কৃষ্ণচরিত্রকে আদর্শ-চরিত্র প্রতিপন্ন বিশেষ শক্ত শুধু নয়—এ একরকমের দুরধিগম্য যুক্তি বা কুযুক্তি। কৃষ্ণচরিত্র উপাদানের প্রতিটি অংশ যুক্তির বিচারে আমাদের আধুনিক মনে ভালো লাগে না। তাঁর কৈশোর-প্রেম আমাদের কাছে রুচিকর নয়। তাঁর বহুপত্নীকতা আধুনিকতার পরিপন্থী। তাঁর কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যতরকম ক্রিয়াকাণ্ড লক্ষিত হয়, তা একদিক দিয়ে আমাদের গ্রীক দেবতাদের ভক্তদের পক্ষাবলম্বন স্মরণ করায়। অপর দিকে তাঁকে আধুনিক মেকিয়াভেলির এক পূর্বসংস্করণ বলে মনে হয়। বঙ্কিম এই কাল্পনিক ভাগবতপুরাণের নায়ককে প্রবল যুক্তিতে আদর্শ পুরুষ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর উক্তিতে ভবভূতির রামও অপাংক্তেয় নন।

আমাদের প্রশ্ন জাগে, বঙ্কিম কেন কৃষ্ণকে আদর্শ প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন? এর উত্তর দেওয়া সহজ নয়। সাধারণভাবে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের ক্লাসিক মনোভাবের মধ্যে এরূপ একটি আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল। আমরা পূর্বেই বলেছি যে বঙ্কিম-মানসে একটা স্ববিরোধের সতত সংঘর্ষ চলত। তিনি যা ছিলেন, তা তিনি সন্তুষ্ট মনে স্বীকার করতে পারেন নি। নিজের এই সকল প্রকারের লিমিটেশন তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। আত্মজীবনীর মতো উক্তিতে তিনি মহীয়সী পত্নীকে তাঁর ভবসংসারে তারিণী এবং রক্ষয়িত্রী বলে বর্ণনা করেছেন। নানা সূত্রে যা জানা যায় তাতে তখনকারের বাবু-কালচারের কিছু দোষও তাঁর মধ্যে ছিল বলে ধরা অসঙ্গত নয়। অথচ তিনি সেজন্য কুণ্ঠিত বা লজ্জিত অনুভব করলেও সেসব দোষ প্রায় ছাড়িয়ে উঠতে পারেন নি। এই কমপ্লেক্স একপ্রকার রোগের মতো তাঁকে অভিভূত করত—এমন অনুমান অসঙ্গত হবে না। আমাদের মনে হয়, তিনি একটা কিছু হয়ে উঠতে চাইতেন। এই হয়ে-ওঠাই তাঁকে "অনুশীলন" এবং "ধর্মতত্ত্ব" রচনায় প্রেরণা দিয়ে থাকবে; এবং কী হয়ে ওঠা যায়, সেই পুরুষপ্রবর প্রবল এবং সর্বদোষকেও স্বীয় ব্যক্তিত্বপ্রাবল্য গুণে পরিণত করা যায়, তারই বিকল্প সৃষ্টি হলেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। আর, যে কারণেই হোক, এই প্রবন্ধসংগ্রহগুলির প্রতিপাদ্যের সঙ্গে আমাদের কিছুমাত্র সহানুভূতি না থাকলেও বঙ্কিমের উপস্থাপনা যে প্রশংসার্হ, সেকথা আমাদের স্বীকার করতে হয়ই। ঠিক জানি না বঙ্কিমের পক্ষে হেগেলের "ফিলসফি অব হিসট্রি" পড়া সম্ভব ছিল কিনা। পরবর্তী কালে নাৎসিদর্শন উক্ত "ফিলসফি অব হিস্ট্রি" থেকে খানিকটা তত্ত্বদর্শন গ্রহণ করেছিল বলে আমরা জানি। জ্ঞানে-অজ্ঞানে এই কৃষ্ণচরিত্র আমাদের দেশের ধর্মান্ধ রাষ্ট্রনেতাদের মধ্যেও মুগ্ধতা সৃষ্টি করে থাকতে পারে। এদেশের হিন্দু-মুসলমানের বিভেদনীতিকে ইংরাজ বাইরের দিকে শাণিত করে পুষ্ট করেছিল। তেমনই ভিতরের

দিক থেকে রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন হিন্দু মানসিকতাকে বঙ্কিমের এজাতীয় রচনা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে পুষ্ট করে থাকবে বলে আমাদের মনে হয়। বিভিন্ন দলীয় নাম বাহুল্যভয়ে উল্লেখ করলাম না। সদর্থক নাই হোক, বর্তমানে নঞর্থক রূপেও বঙ্কিমের এসকল রচনা আজও অর্থবহ হয়ে রয়েছে, এবং ক্ষতিকারক কুফল প্রসব করে চলেছে বলা যেতে পারে। তবে বঙ্কিম আজকের দিনে কী রূপ নিতেন, তা বলা শক্ত। তাঁর যুক্তিবাদের সঙ্গে তাঁর ভক্তিবাদ দুই মেরুতে অবস্থান করে। এটার দুই অর্থ সম্ভব। হয়তো অনেক লেখকের মতো (যেমন পরবর্তী কালে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়) তিনি হিন্দু মানসিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে প্রায় অজ্ঞাতে মুসলমান চরিত্র সৃষ্টি করলেও মুসলমান সংস্কৃতি আর সমাজকে অবহেলা করে গেছেন। আর এজন্য যুক্তিসিদ্ধ মন ছিল বলেই দোষটা তখন ব্রিটিশ ভেদনীতির স্কন্ধে মাত্র চাপিয়ে দেন নি। লক্ষণীয় যে, তিনি হিন্দুর প্রশংসাকারী—মুসলমানের প্রত্যক্ষ নিন্দাকারী নন। অথচ সে রচনায় মুসলমানকে গ্রহণে অসহিষ্ণু হিন্দুর চোখে মুসলমান দৃশ্যমান। দ্বিতীয় অর্থে এও সম্ভবপর যে তিনি সচেতন দায়িত্বে মুসলিম সংস্কৃতি আর ভারতীয় মুসলিম সত্তার বিরোধীই ছিলেন। এটা ভাবতে খারাপ লাগলেও কথাটা সত্য। বঙ্কিমের প্রকৃত প্রতিভার বিশ্লেষণ করতে গেলে এ দিকটাও দেখা প্রয়োজন বলে মনে করি। তাঁর সৃষ্ট মুসলিম স্ত্রী-পুরুষ চরিত্র আশ্চর্য রূপ পরিগ্রহ করেছে ওসমান চরিত্রের বিশ্বস্ততায় মীরকাশিমের চরিত্রবলে। আয়েষা-মতিবিবি, দরিয়া-জেবউন্নিসার ঐশ্বর্যময়ীদের বেদনাদিগ্ধ যন্ত্রণার চিত্র বড়ো করুণ এবং বাস্তব। অথচ এর পাশাপাশি হিন্দু বীরদের চিত্র অনেকাংশে যেন ক্লাসিক টাইপ চরিত্র, এবং সেই কারণে অবাস্তবও। তাঁর রচনা থেকেই যে তথ্য পাচ্ছি তার আধারে এটা বলা সম্ভব যে বঙ্কিম-মানসে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বসংঘর্ষের প্রবহমান ধারা একটা ঐতিহাসিক তথ্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল। সেই ইতিহাসের রূপায়ণে তাঁর অনেক গ্রন্থ (যেমন "রাজসিংহ") মাত্রা ঠিক রাখতে পারে নি। দেশপ্রেম বা জাতিপ্রেম সমর্থনে দোষ নেই; কিন্তু সেটা প্রমাণ করতে গেলে অন্য জাতি বা অন্য ধর্মের প্রতি কোপ, কটাক্ষ এবং আঘাতের অপমান নিশ্চয়ই যুক্তিসিদ্ধ নয়। এদিক দিয়ে বঙ্কিমের ইতিহাসদর্শন ঐকদেশিক। সেই ঐকদেশিকতার সমর্থনে শুধু একটা কথাই বলা যেতে পারে—সাম্প্রদায়িকতার যে সুপ্ত বীজ 'বিষবৃক্ষে' রূপায়িত হতে পারত, বঙ্কিম সত্যই তার সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন। এটি যদি সদর্থক দিক হয়, তবে তাঁর ঐকদেশিকতার নঞর্থক চিত্রায়ণই স্পষ্টতর হয়েছে, এবং পরবর্তী যুগধর্মে তা সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ সাহিত্যেও সৃষ্টি করেছে, বলা যায়। রমেশচন্দ্র দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনায় বঙ্কিম-মানসের ছায়া দেখা যায়। তবে রমেশচন্দ্র দত্তের ঐতিহাসিক প্রবণতা অনেক স্বচ্ছতর। বঙ্কিমের ঐকদেশিক স্বদেশী ভাবনা হিন্দুতাৎপর্যমুখী হলে ক্ষতি ছিল না, যদি তার দ্বারা একেবারে নাম করে মুসলমানবিদ্বেষের কারণীভূত না হত। বঙ্কিমের বিপক্ষে একটিমাত্র কথাই বলার থাকে—সেটা হল তিনি অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমান জীবনকে বা মুসলমানের তৎকালীন জাগৃতি এবং জাতীয়তাবোধকে স্বীকৃতি দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন। কথাটা মর্মান্তিক সত্য যে তিনি যখন খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তখন মোরেলগঞ্জের ইংরাজ-বিরোধী গ্রামীণ নেতা রহিমুল্লা তাঁর সাক্ষাৎ ও সহায়তালাভে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কেন—সে কার্যকারণ ঠিকমতো জানা যায় না। রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধের কথা স্বতন্ত্রবোধে এখানে আলোচনা করলাম না।

বর্তমান সাহিত্যে প্রাসঙ্গিকতা

বঙ্কিমপ্রতিভার নিছক বলিষ্ঠতার প্রশংসা করলে প্রকৃত মূল্যায়ন হয় না। আন্তরিকতা আর নিরপেক্ষ সমালোচনার একটা মূল্য আছে। বঙ্কিমপ্রতিভার

কিছুমাত্র অপলাপ হবে না অথবা তাঁর উৎকৃষ্ট অবদানের হিমালয়প্রতিম উচ্চতার অবনমনও হবে না, যদি আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে মানুষ হিসাবে দেখি এবং তাঁকে অভ্রভেদী উচ্চতায় না রেখে 'দর্শন' করি। বিদেশে সমালোচনা কথাটার সার্থক প্রয়োগ আছে, এবং তা নিয়ে সৎ সাহিত্যও সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের দেশেই বা তা অসম্ভব হবে কেন? এদিক দিয়ে দেখলে বঙ্কিম-মানসকে তৎকালোচিত পরিপ্রেক্ষিতে রেখে আমরা দেখতে পারি। সেটা দিব্যদর্শন নয়, বরঞ্চ বিশ্লেষণাত্মক দর্শন।

উক্ত দর্শনের ফলে আমরা দেখি—বঙ্কিম মানুষ হিসাবে বঙ্কিম বা বক্র না হলেও তাঁর মনোভূমি খুব স্বচ্ছন্দ হয় নি। তাঁর কথাতেই বোঝা যায় নারী-জাতির প্রতি একই সাথে ছিল তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ্য আর দুর্বলতা, দুই-ই। এই দোলায়মান ভাবনা কি তাঁর একান্ত নিজস্ব ভাবনাও ছিল না? সেই ভাবনার প্রজেকশন কি সৃষ্টি করে নি নগেন্দ্র বা দেবেন্দ্র চরিত্র? মাত্র দু-একটি উন্নতচরিত্র মানুষ পাওয়া যায়, যারা স্বাভাবিক—যেমন ওসমান। এমন সার্থক চরিত্র খুব কম। চন্দ্রশেখর, অমরনাথ বা প্রতাপ মহৎ, এবং সেজন্য খুব সহজবোধ্য নয়। পশুপতি ভিলেন-তুল্য। অপর পক্ষে, জগৎসিংহ, ইন্দিরার স্বামী এবং অন্যান্য রাজা-রাজপুত্রেরা কলকাতায় তৎকালীন বাবুসমাজের চিত্র বলা সঙ্গত। হরবল্লভ, রামরাম দত্ত, "রজনী"তে চিত্রিত লবঙ্গলতার স্বামী—কিছুটা মলিয়েরের নাটকোচিত চরিত্রের ক্ষীণ ছায়ানুসরণ—এবং এদেশের মাটিতেও বেশ জীবন্ত। রাজসিংহ, সীতারামকে খাড়া করা হয় দেশপ্রেমিক হিসাবে। অন্যদিকে জীবানন্দ এবং প্রফুল্লর স্বামী (বহুপত্নীক) ব্রজবল্লভ খুবই সাধারণ চরিত্র বলা যায়। দুই-একটি পুরুষচরিত্র যে দীপ্যমান তা হল কপালকুণ্ডলার স্বামী নবকুমার, এবং দরিয়া-বিবির স্বামী এবং জেবুন্নিসার প্রাক্তন প্রেমিক মুবারক। এ চরিত্রগুলি শুধুমাত্র স্বাভাবিকই নয়—স্বাভাবিক মনুষ্যত্ববোধের মধ্যে যে সহজাত একপ্রকার আদর্শবাদ মানুষকে আত্মোত্তরণে ব্রতী করে, সেই বলে বলীয়ান। এ ছাড়া টুকরো সৃষ্টি আছে—আসমানী আর দিগগজ পণ্ডিত এবং গিরিজা আর তার প্রেমিক। এগুলি প্রকৃতিস্থ মানুষের ছোটো সংসারের ক্ষুদ্র অথচ যা তুচ্ছ নয়—সেসব সুখদুঃখের পরিচায়ক। বিচিত্রতর কথা এই যে, তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র নারীচরিত্রচিত্রণে প্রায় সিদ্ধহস্ত। নারীর প্রেম এবং প্রেমাভিমান সম্পর্কে তাঁর দিগ্‌দর্শন প্রায় নির্ভুল। তাঁকে বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার উৎসস্থল বলা সঙ্গত—বিশেষভাবে ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারীচরিত্র অঙ্কনের জন্য। শ্রী, মতিবিবি, আয়েষা, সূর্যমুখী, কপালকুণ্ডলার ঐশ্বর্যময়ী উপস্থাপনা একেবারে আঙ্গিকিক নয়। তাঁদের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ক্ষতকে তাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন। বিমলা, শৈবলিনী, রোহিণী, লবঙ্গ ব্যক্তিত্বসম্পন্না। কিন্তু তাঁরা ভাগ্যের হাতে প্রায় পরাজিত। এঁদের মধ্যে রোহিণী এবং শৈবলিনী তাঁদের প্রেমের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ও প্রায় অপমৃত্যুগ্রস্ত। এর দ্বারা বঙ্কিম এ সবল চরিত্রগুলিকে লাঞ্ছিত করেছেন। বঙ্কিম যে কারণেই হোক, সুস্থ ঘরোয়া জীবনে কুন্দনন্দিনীর প্রেমকেও গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। সেইজন্য নগেন্দ্র-চরিত্র প্রায় পরাভূত এক বাবুচরিত্রমাত্র। বঙ্কিম মনে করতে পারেন নি যে, একবার বিশ্বাস ভাঙলে, অন্তরকে দ্বিখণ্ডিত করলে আর তা জোড়া লাগানো যায় না। অবশ্য বঙ্কিম সে চেষ্টা করেন নি। তাঁর সূর্যমুখী-নগেন্দ্রর কী হল বা কপালকুণ্ডলার সংসার করা সম্ভব হত কিনা—এসব প্রশ্নও রয়ে যায়। কপালকুণ্ডলার বা মতিবিবির মতো সার্থক চরিত্র সর্বকালের সর্বদেশের চরিত্রায়ণ বলা যায়। তাদের পাশে নবকুমার বেমানান নন কিন্তু।

বঙ্গসাহিত্যে ভাবদর্শী বঙ্কিম রোমানটিক উপন্যাসের পথস্রষ্টা একথা বলা যায়। কিন্তু তাহলেও যে কারণেই হোক, সংস্কারপন্থী বঙ্কিম রোমানটিক প্রেমকে সাহিত্যজীবনে (হয়তো বা স্বজীবনে) অপরাধবোধ হিসাবেই দেখেছেন। সে দেখার ফলে চরিত্রের সহজ-গতি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বলিষ্ঠ চরিত্র (যেমন রোহিণী) তাঁর কলমের বিড়ম্বনায় একরাত্রে স্বৈরিণী হয়ে ওঠে জীবনের তাগিদে। অথচ বঙ্কিম সংস্কারের উপরে গিয়ে তাদের বাঁচতে দেন নি—দিতে চান নি বা দিতে পারেন নি। সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্বে তিনি সর্বদা যে পথ দেখেছেন তা হল একপ্রকার পলায়নের পথ। সেই পথ শৈবলিনীর মস্তিষ্কবিকার এবং তার চিকিৎসা, অথবা কুন্দের বিষপান, হীরার উন্মাদরোগ এবং রোহিণীর হত্যা তথা গোবিন্দলালের কৃত প্রায়শ্চিত্ত বা সন্ন্যাসগ্রহণ। সম্ভবত, পাপ অপরাধবোধ এবং তৎকালীন সমাজের অনুদারতাযুক্ত পরিবেশ বঙ্কিমকে সাহিত্যিক হিসাবে পথিকৃৎ সাহিত্যিক করলেও মহৎ সাহিত্যিক করতে পারে নি। বিমলা বা লবঙ্গকে তিনি স্বীকার করতে পারে নি। তাঁর অন্বিষ্ট হল কমলমণি, ইন্দিরার সখী—তিলোত্তমাদের মতো নিরদ্বন্দ্ব চরিত্রগুলি। সংসারে যেটা সর্বত্র সুলভ নয়।

উপসংহার

আমার এই সামান্য রচনায় বঙ্কিম-মানসের নানা-দিকের একটা দিগদর্শনমাত্রও সম্ভব হল কিনা তা আমারও জানা নেই। আমার প্রতিপাদ্য হল বঙ্কিম-মানসের প্রাসঙ্গিকতা আজকের দিনে আছে কিনা বা থাকলেও তার সীমা কতখানি। সেই প্রসঙ্গে উপন্যাস এবং প্রবন্ধাদির একটা মোটামুটি আলোচনামাত্র করে আমি এ আলোচনার শেষ প্রান্তে এসেছি।

শেষ প্রান্তে এসে আবার কমলাকান্তের একটি অপরূপ যুক্তি মনে পড়ছে। এটি 'দেশী হাকিমদের আমি কুমড়া মনে করি।' বেশ বড়ো ফল—লাল রঙ। চালে উঠিয়ে দিতে হয়, এবং দিলেও একটু ঝড় হলেই ডাল ছিঁড়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে হয় তাদের। উক্তিটা ঠিকই আছে, শুধু সেটার ব্যাপ্তি আমি আরো একটু নিজমনে বাড়িয়ে নিয়েছি। আজকের দিনে কুমড়ো হওয়াটা একটা ব্যাপক রোগবিশেষ। এটা বোধ করি আমাদের দেশীয় রাষ্ট্রনীতির সর্ব-প্রকার অঙ্গনে প্রযোজ্য। শিক্ষা আর সংস্কৃতি, অর্থ, বিচার, সমাজকল্যাণ, পরিবহণ প্রভৃতি সকল প্রকার উদ্যোগেই আজকের দিনে বঙ্কিমের সেদিনের বক্রোক্তির সঠিক মূল্যায়নের একটা সময় এসেছে। এটা তাঁকে ক্রান্তদর্শীর ভূমিকা দিতে পারে কিনা, পাঠকই তার বিচার করবেন।

প্রসঙ্গত, বঙ্কিমের প্রায় শেষ দিকের রচনা "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে"র উল্লেখ করে এই রচনা শেষ করি। মুচিরাম গুড় একপ্রকার টাইপ চরিত্র। এ চরিত্র আপন নিয়মে গড়ে ওঠে, হয়তো ভাগ্যও তাকে সহায়তা করে। বর্তমান ভারতে মুচিরামরা একটা বেশ বড়ো সংখ্যার এবং বড়ো দরের মানুষ। তাঁদের শুধু প্রমাণ করে দেওয়া প্রয়োজন—তাঁরা যেটা প্রমাণ করতে চান সেটা। অর্থাৎ জমিদার না হলেও চলে, প্রমাণ হওয়া চাই জমিদার। জমিদারি-প্রথার অবলোপ ঘটেছে বলে শোনা যায়, যদিও সর্ব-ভারতীয় তথা বঙ্গীয় কৃষককুল পায়ের তলে মাটি এখনও পায় নি। হাকিম না হলেও চলবে—বিচার না করলেও চলবে—শিক্ষা না হলেও চলবে—শিক্ষকের শিক্ষাদানও অবশ্য-কর্তব্য নয়। উদারতার বা আন্তরিকতার কোনো প্রয়োজন হবে না, অথচ সব-রকম আয়োজনের একটা ছায়াব্যবস্থা থেকে যাবে—সেইমতো দেখিয়ে যেতে হবে বা শুনিয়ে যেতে হবে যে চালু ব্যবস্থা আছে—তাহলেই যথেষ্ট। মুচিরামের হাকিমি জমিদারি এবং দাক্ষিণ্য সবটাই ঘটেছে মৌখিক প্রচারণা তথা প্রতারণার মধ্য দিয়ে। আজকের দিনের ভারতরাষ্ট্রে তথা বঙ্কিমের বঙ্গদেশে বহু রঙ্গ পরিদৃশ্যমান। কিছু না হলেও সব হয়, সবাই মিলে সোচ্চার হলে ন্যায়কে অন্যায় করা যায়, অন্যায়কে ন্যায় করা যায়—এর চেয়ে বড়ো ধর্মতত্ত্ব আর কী হতে পারে? সেদিনের বঙ্কিমের প্রতিপাদ্য পার্থসারথি কৃষ্ণও আজ আর একা নন। 'বহুরূপে

সম্মুখে তোমার' এ নীতিতে আজ বিশ্বাস না করে উপায় কী। শাসক এবং শাসিতের নির্মাণে মুচিরাম গুড় নব-নব রূপে প্রতীয়মান নেতারূপে-শাসকরূপে-সমাজসেবী-রূপে-সংস্কৃতিসাধকরূপে-শিক্ষাত্রাতারূপে—কোথায় নয়। আমাদের মানতেই হয়, বঙ্কিম কোনো ষষ্ঠ সম্বিৎ দিয়ে আজকের ভারতবর্ষের তথা বাঙলার অনুধ্যান করেছিলেন। তাঁর সকল সংস্কার শুদ্ধ তিনি আজও অপ্রাসঙ্গিক নন।

পুনশ্চ: এ নিবন্ধ রচনার শেষ দিকে আমরা সুগবেষক জনাব আজহারউদ্দীন খান মহাশয়ের একটি সুলিখিত প্রবন্ধ ("চতুরঙ্গে" প্রকাশিত) পাঠের সুযোগ পেয়ে বিশেষ উপকৃত আর আনন্দিত হয়েছি। যথার্থ মূল্যায়ন যে কত দূর নিষ্পক্ষ আর অকপট হতে পারে—তাঁর এই উপাদেয় মৌলিক রচনাটির মধ্যে তা স্পষ্ট।

প্রথিতযশা সাহিত্যিক, ভাষাতাত্ত্বিক এবং চিন্তাবিদ গোপাল হালদারের জন্ম ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯০২। হিসাব-মত তাঁর বয়স এখন নব্বই এর কোঠায়। এই বয়সেও তাঁর মেধা অম্লান এবং আলোচ্য বিষয়বস্তুর গভীরে প্রবেশ করার ক্ষমতা বিস্ময়কর। আলোচ্য প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (জন্ম : ২৬. ৬. ১৮৩৮ ; মৃত্যু : ৮. ৪. ১৮৯৪)-এর একশো তিপান্নতম জন্মবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে মুদ্রিত হল।

সাংচুয়ারি

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

জন্তুর দেখা নেই, অগত্যা দুহাত মাটিতে রেখে হই চতুষ্পদ!
ওগো ভাত-ডাল, হে জলের ক্বচিৎ জিহ্বায় এগিয়ে আসা মাছ
আর তোমাদের প্রয়োজন নেই, আমাদের
এবার আমোদ খাদ্য বন্য বরাহ, বাচ্চা হরিণ
হাড়সংকুল এদেরই অবাধ মাংস আমাদের প্রিয় খাদ্য হোক!

জন্তু এতদিন যত মানুষের নিঃশ্বাস নিঃশব্দ থামিয়েছিল
মানুষ মেরেছে জন্তু তার বহু গুণিতক বেশি,
তাই কি বন এমন খামখেয়ালি খালি!
কুঠার না-চেনা গাছে কিছু-কিছু পাখি এখনো রয়েছে,
চাঁদ টুকরো করা নদীও রয়েছে তেমনি বনের অভিভাবক,
শুধু বনে জন্তু নেই, তাই বোধহয়
কবিতাতেও আজকাল আর লেখা হয় না বনানী!
জানি আমাকে এবার জন্তু হয়ে উঠতেই হবে,
মানুষেরা এখন তেমন ঠিক মানবিক নেই যে তাদের
নির্বিকার বলতে পারব এসো জন্তু হই এসো
দেশ বা বিদেশে যেদিকে তাকাই আজ জন্তু শুধু চোখে পড়ে
যে হাত আকাশ লিখত—এসো,
সেই হাত এবার মাটিতে রেখে হই চতুষ্পদ!

ভূ-স্বর্গ

দেবী রায়

ওই খরস্রোতা-প্রাণোচ্ছল নদী, পাহাড়ের বুক ভেঙে বয়ে
যায়—পৈতের মতো ঝরনা, এই পাথর, ওই উদার উন্মুক্ত পাহাড়
খোলা আকাশের নক্ষত্র, রাত্রের চাঁদ, আর দিনের সূর্য
যা লেগে থাকে আকাশের গায়ে! যা ফেটে পড়ে আবেগে।
এক-একদিন এসবি আমি লক্ষ করি, আনন্দে! এ কাজেই
আমার আনন্দ আর বেঁচে থাকা

পাহাড়ের কোলের কাছে ছোট্ট
একফালি আপেলবাগানের-ঘাসে, অলকা সে শুয়ে
থাকে কিসের নেশায়? তাকে ঘিরে উড়তে থাকে
হলুদ প্রজাপতি

তার আবাহনও নেই, বিসর্জনও—
সে আমাকে তার না মনে করল সমকক্ষ এক মানুষ
না নিকটতম প্রতিবেশী! কোনো কিছুতেই হেলদোল নেই
নেই ভ্রুক্ষেপও। তবু সে আমাকে চিনে নেয় মুহূর্তেই,
বুঝে নেয় আমার ভাষা! বরং, আমিই তাকে সঠিক বুঝতে
পারি না! তার সেই আশ্চর্য চোখ, আমাকে টেনে রাখে
কী এক সম্মোহনে

সে, আমাকে শেখায়: আকাশে আঁধার ঘনিয়ে
আসার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হয়···নইলে, ঠিক বোঝা যায় না
স্পষ্ট আলোর মহিমা। তাঁকে কি এই পাহাড়, এই প্রকৃতি গ্রাস
করে নেয়—না পেয়ে বসে? জিজ্ঞাসা করি: কাজ-কাম করতে
ইচ্ছে হয় না?

প্রত্যুত্তরে জানায় সে, যার মর্মার্থ: মৌমাছি-প্রবৃত্তি তার নেই।
ঘৃণা করে
সে! সকালে খেয়েছে ভরপেট রাত্রে খাওয়ার কোনো জরুরত নেই!
পরের ভাবনা পরের! একদিন তো এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে
বরাবরের মতোই, তো আজ থেকে কান্নাকাটির কী অর্থ···?

আমি একটু তামাসা করি, বলি: 'তা না হয় হল,
তা আজ পাহারার কাজে গেলে না যে?'
—'দিল নেহি লাগতা।'

এ ভয়ংকর কঠিন উত্তরের জন্য ছিলাম
না প্রস্তুত! আমি এক শহুরে কর্মকীট, সঞ্চয়প্রবৃত্তি, বর্তমান
ও ভবিষ্যতের ভাবনায় আমায় সর্বক্ষণ ঘিরে রাখে। কংক্রিট-
খুপরি তার সাক্ষী! পঁচিশ-ত্রিশ দিনের শৌখিন পর্যটনে ওই পাহাড়,
প্রকৃতির এই সন্তানকে চেনাজানা আমার উপলব্ধির বাইরে···
—সবি যদি দুদিনের, ক্ষণস্থায়ী? তবে কেন এই অস্থিরতা? পিছুটান?
তাড়না-ই বা কিসের? কী সেই সংকট? যা কেড়ে নেয় নিয়ত
সেই আকাঙ্ক্ষিত ঘুম!

পাহাড়ের-হাওয়ার হা-হা দমকা
হাসি আর তার সাথে একরাশ ঝরাপাতা উড়ে আসে।

কলকাতা কেমন আছে

অসীম রেজ

এখন শব্দ করলে কোনো প্রতিধ্বনি হয় না বাতাসে,
জনহীন ফুটপাতে শুধু কয়েকটি মানুষের
নির্লিপ্ত ভঙ্গি আঁকা হয়,
সাইনবোর্ডে ঢেউ তুলে ডুবে যায়
প্রলম্বিত রঙের শরীর।
আমার শহরের প্রতি প্রীতি ও ভালোবাসা
দেওয়াল-লিখনের মতো প্রায় অস্পষ্ট ও ধূসর,
ট্রামেবাসে গাদাগাদি ভিড়ে ভেঙেচুরে দুমড়ে-মুচড়ে
যৌবনের সকল স্বপ্নবিলাস
হঠাৎই থেমেছে একদিন
সবুজ আলোর সংকেতে;
দেখি চৌমাথার মোড়ে লেবেল ক্রশিং তুমি পার হও,
তোমার একটুকরো হাসির ছোঁয়ায়
আমার অনন্ত পাওয়া
নিভৃতে এককোণে ট্রামের শেষ জানলায়।
তোমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে আজ আসে নি কেউ
আমি একা,
মনে পড়ে তোমার টফির ভাঁজের ভিতর লুকোনো
আমার ভালোবাসার কথা?
কবিতায় এসেছে বিস্বাদ,
তেতো কফির পেয়ালায় জীবনের অর্থহীন বেঁচে থাকা,
বিষণ্ণ করিডোর জুড়ে আমাদের প্রতিটি প্রহর,
রোজ দেখা হয় সিঁড়ির নীচে
তবু চিনতে পারি না,
তোমার মলিন, ম্লান মুখচ্ছবি যেন ফটোফ্রেমে বাঁধা স্থির,
বাতাসে পুরোনো বইয়ের গন্ধ,
তোমাকে ঘিরেছে স্কাইস্ক্র্যাপারের নির্জনতা।

এই শহরের প্রতিটি গাছের পাতা আমার চেনা,
গলির মোড়ে সেই বকুলের গন্ধ,
তোমার হারানো রুমালে মোছা আমার গায়ের ঘাম
এখন ফুটপাতে হাজার ছড়ানো;
তিক্ত বিরক্ত তুমি সকাল সন্ধে টহল দিয়ে ফের
একটা গোলাপ আর দেয় না কেউ,

থামের নীচে হিম জমে থাকা অন্ধকার
আমি দেশলাই জ্বালাই,
বাস স্টপেজে দেখি
তোমার গলা ছাড়িয়ে উঠেছে প্রায় আকাশের কাছাকাছি।

শীতগ্রীষ্মবসন্ত পার হয়
আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করি, শুধু অপেক্ষা করি,
সত্যি বলো একটিবার
তোমার কি এখনও জানতে ইচ্ছা হয়
কলকাতা কেমন আছে?

এগিয়ে চলেছি

সৈয়দ সমিতুল আলম

মনে পড়ে, সেই অদ্ভুত রহস্যের কথা, ত্যাগ, তিতিক্ষা, করুণার কথা, প্রশান্তির কথা; মনে পড়ে, তুমি বলতে শোনো এক মজার গল্প··· অদ্ভুত এই জীবন আমাদের, হায়! কত নতুন শিহরন, কত শান্ত উল্লাস, কত নতুনভাবে বয়ে যাচ্ছে আনন্দশরীরে আর-এক বিষাদে, তরাসে কেঁদে উঠছে এই বিপন্ন জীবন

মনে পড়ে, তুমি বলতে এই চরাচর, ত্রস্ত প্রজন্ম, অন্ধতা, আগুন-আগুন হয়ে ছুটে যাচ্ছে ধ্বংসের মুখে, তুমি বলতে ভয়ংকর এক ভুলের মধ্যে দিয়ে কেটে যাচ্ছে আমার মানব-দর্শন—আমার বধিরতা, ব্যর্থতাবোধ

তবু, আজও অনিমেষ, সেই স্তব্ধতা নিয়ে, যুদ্ধের আতঙ্ক নিয়ে, বিপন্ন জীবন নিয়ে, এগিয়ে চলেছি দেখো, আরো নতুন মৃত্যুবোধ, আরো নতুন আত্মচিৎকার, অসহায় আলোর সাথে আরো এক সৃষ্টির মুখে

রবীন্দ্র-গবেষণার এক অভিনব ধারা

গৌরী আইয়ুব

মননশীল লেখিকা এবং নিরলস সমাজকর্মী গৌরী আইয়ুব এ যাবৎ যখনই কলম ধরেছেন তাঁর লেখার প্রতি সমাজ-সচেতন পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে অপ্রতিরোধ্য-ভাবে। কারণ, শুধু লেখার জন্য না লিখে তিনি কলম ধরেন সমাজ, সাহিত্য এবং মানুষের জন্য বিবেকের তাড়নায়, বিশেষ পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনের তাগিদে। মৃদু অথচ স্পষ্টভাষী তাঁর লেখা নিবন্ধগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বিদুষী, বহুভাষাবিদ কেতকী কুশারী ডাইসন আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি একাধারে অত্যন্ত পরিশ্রমী ও অনুসন্ধিৎসু, গবেষক, সূক্ষ্মরুচি-সম্পন্ন সাহিত্যবোদ্ধা এবং কৃতী সাহিত্যিক। তাঁর রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক গবেষণা-গ্রন্থ দুটি নিয়ে কয়েক বৎসর যাবৎ আলোচনা শুনছি। এতদিনে পড়বার সৌভাগ্য হয়েছে। অনেকটা বিলম্বে হলেও দু-চার কথা বলবার আগ্রহ বোধ করছি, হয়তো বা সেকথা আগেই কেউ লিখেছেন, জানি না।

মলাটের ঘোষণা অনুযায়ী 'অভিনব পদ্ধতিতে নির্মিত এই বই' "রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে" 'যেন এক নদী যার একটি ধারা কেতকী কুশারী ডাইসনের দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস, অপর ধারা তাঁর কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা।' গঙ্গাযমুনার এই মিলিত ধারায় নামবার আগেই মনে কিছু সংশয় যে জেগেছিল অস্বীকার করব না। কারণ গবেষককে হতে হয় নির্মোহ অনুসন্ধানী—তথ্যভিত্তিক, বিষয়নিষ্ঠ তত্ত্ব গঠনে সিদ্ধহস্ত। কথাসাহিত্যিকের জাত আলাদা—তাঁর সংরক্ত হৃদয়ের আলিঙ্গনে বিষয় ও বিষয়ী পরস্পরে ওতপ্রোত হয়। বুঝতে পারছিলাম না যে কেমন করে একই রচনায় একই ব্যক্তি গবেষক আর ঔপন্যাসিকের দ্বৈত ভূমিকায় দুই মেরুতে দোলকের মতো আন্দোলিত হতে থাকবেন—কখনও তিনি তন্নিষ্ঠ গবেষক, কখনও তদাপ্লুত শিল্পী। তবে একটা চ্যালেঞ্জ তো বটেই! ভাবছিলাম কোনো মহৎ সৃষ্টি হয়তো বা হয়েও উঠতে পারে এই অভিনব আঙ্গিকে। তা ছাড়া সাহিত্যরচনার ব্যাকরণ-না-মানা এই 'সিংহরিণ' সম্বন্ধে কৌতূহলও বোধ করছিলাম বই কি!

বইখানি তন্ন তন্ন করে পড়লাম। কিন্তু কেন যে এমন একটি শ্যামদেশীয় যমজ প্রসব করা তাঁর নিতান্ত প্রয়োজন মনে হল বুঝতে পারলাম না। এই প্রসূতি তো প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসের শিকার নন। কী-জাতীয় সাইকোলজিক্যাল কমপালশান বা তীব্র মানসিক চাপ ছিল যার ফলে একটি গবেষণার প্রতি-

বেদন এবং একটি উপন্যাস এভাবে পরস্পরে প্রবিষ্ট হয়েছে? যাই হোক, তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে ধরতে না পারলেও একথা ধরে নেওয়া যায় যে 'তাঁর লেখার গঠন বাইরে থেকে চাপানো নয়, ভিতরের তাগিদে ভিতর থেকেই হয়ে ওঠা, "অরগ্যানিক" বা জৈব।' এই আঙ্গিকেও কি বলা হবে psychic kaleidoscope?

লেখিকা নিজেই কবুল করেছেন যে, 'মনের কোনো এক নিগূঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে, যাকে পুরোপুরি বিশ্লেষণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, "থীম" দুটি আমার চৈতন্যে সংসক্ত হয়ে গেল।' তবে এই সংসক্ত হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি তো সজ্ঞান সাহিত্যকর্মও বটে। পরস্পর সংসক্ত এই "থীম"একটি সযত্নপ্রসাধিত সাহিত্যরচনার রূপ নিয়েই তো ভূমিষ্ঠ হয়েছে। এ তো মোটেই মনোবিকলন-প্রক্রিয়ার মুক্ত অনুষঙ্গে প্রাপ্ত আপাত-বিক্ষিপ্ত আলাপচারণা নয়। তবু উদ্দেশ্য খুঁজবার জন্য লেখিকার নিরজ্ঞান মনে ডুবুরি নামাবার কোনো প্রয়োজন দেখি না। রচনার উপরিতলকেই সাবধানে অনুধাবন করে আমার মতো সাধারণ পাঠক-পাঠিকা যতটুকু বুঝতে ও উপভোগ করতে সক্ষম, তার ভিত্তিতেই আলোচনা করা যাক।

বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে উপন্যাসের নায়িকা অনামিকার সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। তার এক সেফার্দিক ইহুদী বান্ধবী এমিলিয়ার সাহায্যে লাদিনো উপভাষার লোকগীতি অনুবাদ করছে। দ্বিতীয় অধ্যায়টি একটি পুস্তক-সমালোচনা: ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর যে প্রামাণ্য জীবনী ডরিস মায়ার রচনা করেছেন, তারই। অধ্যায়ের একেবারে শেষে পৌঁছে জানা গেল পুস্তকসমালোচনাটি শ্রীমতী অনামিকাই লিখেছে, এবং সদ্য ডাকে দিয়ে এসেছে, ধরে নেওয়া যেতে পারে কলকাতার "দেশ" বা "জিজ্ঞাসা"র উদ্দেশে। অর্থাৎ এই অধ্যায়েও উপন্যাস চলছে—তবে 'গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা'-র সঙ্গে এবার তার গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেল। এবং নিশ্চিত জানা গেল, "রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়া ওকাম্পো-"র সন্ধানে যে যাত্রা করেছে সে এই 'অনামিকা'। অথচ বইয়ের মলাট পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল তিনি কেতকী কুশারী ডাইসন। শুনেছিলাম যেন এই সন্ধানী গবেষণাকর্মের জন্যই তিনি আনন্দ-পুরস্কৃত-ও হয়েছিলেন।

দুজনের অভেদ প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে-সঙ্গে আরও একটি প্রত্যাশার সৃষ্টি হয়েছিল। ডরিস মায়ার রচিত জীবনীতে এবং তাঁকে অনুসরণ করে পুস্তক-সমালোচনা লেখিকার (অনামিকা/কেতকী যে-ই হোন) রচনাতেও জানা গেল যে এই বৃত্তান্তের ঝোঁকটা ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর 'love life'-এর উপরে তত নয়, যতটা কিনা 'loves of her life'-এর উপর। জেনে খুব ভালো লেগেছিল। কারণ মহিলাদের 'loves of life' বিষয়ে পুরুষরা তো উদাসীন বটেই—মহিলারা নিজেরাও খুব আগ্রহী বলে মনে হয় না। মূল বিষয় থেকে খানিকটা সরে গিয়েও প্রসঙ্গটা একটু আলোচনা করা অনুচিত হবে না।

আবহমান কালের পুরুষশাসিত সমাজে একই পুরুষের শয্যায় 'শৃঙ্খলিতা' মহিলারা স্বাধিকারের লড়াই ঘোষণা করতে গেলে প্রায়ই তাঁরা তাঁদের 'লাভ-লাইফ' নিয়ে এমন জট পাকিয়ে ফেলেন যে তার ফাঁস ছাড়াতেই সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায় দেখি। অথচ কোনো মহিলার বেলাতেও ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ প্রকাশের জন্য আরো যে-কিছু ভালোবাসার যোগ্য বস্তু—'লাভস্ অব লাইফ'—থাকতে পারে বা থাকা প্রয়োজন একথা এখনও এদেশের 'পরমা'-রা ভুলেই থাকেন যেন। তবে কি নারীর মুক্তিযুদ্ধে শয্যাটাই প্রথম, এবং প্রায়শই শেষ, রণক্ষেত্র হয়ে থাকবে? 'মৃণাল'কে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্য ধাতু দিয়ে গড়েছিলেন। বাঙালি মেয়েদের আধাআধি গড়ে ছেড়ে দিয়েছেন বলে বিধাতার বিরুদ্ধে তাঁর যে নালিশ ছিল তারই সুবিচার করতে গিয়ে বোধহয় 'মৃণাল'কে একটা পূর্ণ ব্যক্তি করতে চেয়েছিলেন তিনি। অথচ বাঙলা ১৩২১ সালেই বাঙালি মেয়ের ইমানসিয়েসিয়ন/

লিবারেসিয়নের (কেতকীর যা পছন্দ বলুন) যে স্বরূপ কল্পনা করতে পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ আজও সেখানে আমাদের অনেকেরই কল্পনা এবং দাবিদাওয়া পৌঁছাতে পারছে না কেন?

স্ত্রীশিক্ষা ইতিমধ্যে বেশ খানিকটা ব্যাপ্ত হয়েছে। এদেশেও অনেক শিক্ষিতা মেয়ে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পেরেছেন। আইনের জোরে মেয়েদের সামাজিক অধিকারও কিছুটা সুরক্ষিত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের কল্যাণে মাতৃত্বকে গ্রহণ বা বর্জন করবার যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি তা আমাদের মা-ঠাকুরমাদের কালে অভাবিত ছিল। এর পরেও কি আমাদের বৈপ্লবিক চিন্তা ও কর্মের সবটুকু শক্তি নিঃশেষ হবে এক শয্যার পরিবর্তে একাধিক শয্যায় আমাদের অধিকার সাব্যস্ত করতে? তাহলে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ-উন্নয়ন, রাজনীতি, বিপন্ন মানুষের দুঃখমোচন ইত্যাদি অসংখ্য যেসব কাজ/'প্যাশন'/'লাভ' মহিলাদেরও মাতিয়ে রাখতে পারত সেই দিকে আমাদের আত্মপ্রকাশ যে আজও এত ক্ষীণ, এত দ্বিধাজড়িত থাকবে এতে আর অবাক হবার কী আছে? অথচ 'মৃণাল' তো তার মনুষ্যত্বের পূর্ব অধিকার অর্জন করবার জন্যই, নিজের বিবেকবুদ্ধি মতো চলবার জন্যই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলি থেকে বার হয়ে মেজ বউয়ের খোলস খসিয়ে খোলা আকাশের নীচে এসে দাঁড়াতে পেরেছিল। গার্গী-বাচক্নবীর তুল্য লড়িয়ে মেয়ে আজও যে বিশেষ দেখতে পাই না তার কারণ নিশ্চয়ই এই যে এখনও আমাদের নারীমুক্তির ধারণাটাই স্পষ্ট নয়।

এদিকে আলোচ্য এই অত্যাধুনিক কাহিনীতেও দেখছি: 'অনামিকা জানে, আজও একটি মেয়ের প্রকৃত অর্থে ব্যক্তি হয়ে ওঠা কত সুকঠিন।' মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত ঘরের আদরিনী কন্যা যাঁরা শিক্ষাদীক্ষার সবটুকু সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন তৃতীয় বিশ্বের এই অত্যন্ত অসম সমাজব্যবস্থার মধ্যেও, তাঁরাও আর কতদিন এই অভিমানী অভিযোগ নিয়ে বসে থাকবেন জানি না। অন্যদিকে পুরুষের আত্মপ্রকাশ তথা আত্মবিকাশের পথও কি এই সমাজের সর্বত্র গোলাপের পাপড়িতে ঢাকা? দুনিয়ার তাবৎ মেয়েদেরই কি একটি প্রতিবন্ধী-শ্রেণীভুক্ত করা যায়?

প্রত্যেকটি কৃতী ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর পিছনে আছেন অনেকজন করে সুযোগ-বঞ্চিতা এমিলিয়া। একথা ঠিক। তবে সব যুগে সব দেশে স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে প্রত্যেকটি সার্থক মানুষের আড়ালে যে ঝরে পড়েন অসংখ্য 'mute inglorious Milton' সে কথাও তো মিথ্যা নয়। 'কৃতী মেয়েদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল মানসতা বিষয়ে, যা নারী-আন্দোলনের পথে একটি বিপজ্জনক গর্তস্বরূপ' তার সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়েছেন লেখিকা। 'কিছু কিছু মেয়ে আছেন, যাঁরা পুরুষ-নিয়ন্ত্রিত দুনিয়ায় কিছুটা সফলতা লাভ করতে পেরে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন এবং মনে করেন যে তাঁরা পুরোপুরি 'মুক্ত'। তাঁরা ভাবেন যে এ লড়াইয়ে সব দুর্গ জেতা হয়ে গেছে; পৃথিবীর কোটি-কোটি পরাধীন মেয়েদের কথা তাঁরা ভাবতে চান না। সে-বিষয়ে যে তাঁদের কোনো দায়িত্ব আছে তাও মনে করেন না। নারীর মুক্তিসংগ্রামে এই মেয়েদের ভূমিকা হয়ে দাঁড়ায় ঘরের শত্রু বিভীষণের।

যদিও পুরুষনিয়ন্ত্রিত দুনিয়ায় বিশেষ কোনো সফলতা অর্জন করে উঠতে পারি নি, আপাতত বিভীষণ প্রতিপন্ন হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও বলি: পুরুষ হোক, স্ত্রীলোক হোক কোনো সামাজিক মানুষই কি পুরোপুরি 'মুক্ত' হতে পারে, সমাজের কাছে কিছু স্বাধীনতা সমর্পণ করেই কি তার বিনিময়ে আশ্রয় পাই না আমরা? আর প্রকৃত অর্থে ব্যক্তি হয়ে ওঠা একজন পুরুষের পক্ষেও কি কম সুকঠিন? সমাজ-সংসারে হাজার রকম আরোপিত ভূমিকা কি পুরুষের আত্মপ্রকাশের পথও কণ্টকিত করে রাখে না? ভূমিকা-শাসিত সমাজে পুরুষ-ই কি মুক্ত-মঞ্চের স্বয়ংশাসিত নায়ক?

যাই হোক, আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলনের

পুরোভাগে যেসব মহিলারা রয়েছেন—সব দুর্গ একে-একে জয় করে নেবার জন্য সেমিনার, সিম্পোসিয়াম-ওয়ার্কশপে নিরন্তর লড়াই করে চলেছেন নানা বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং ফাউনডেশানের অর্থানুকূল্যে, তাঁরা কোটি-কোটি পরাধীনা মেয়েদের 'মুক্ত' করার ব্যাপারে কতটুকু কী ভাবেন এবং তাদের জন্য কী করেন জানতে ইচ্ছা করে। 'মুক্ত' মহিলাদের মধ্যেও তো বেশ একটি সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে যাঁরা পুরুষশাসিত সমাজে গাছেরও খান, তলারও কুড়ান; এক হাতে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন আবার অন্য হাতে মূঢ় পুরুষদের শোষণও করেন দেখি। সেই সঙ্গে সময়ে অসময়ে নারীজন্মের বঞ্চনা নিয়ে হা-হুতাশ করেই স্বজাতির প্রতি কর্তব্য সমাধা করেন। ফলে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বেই দেখা যাচ্ছে এক দিকে গুটিকয় কৃতী মহিলা মই বেয়ে সমাজের সর্বত্র মগডালে উঠে পড়েছেন, অন্যদিকে বঞ্চনাসীমার তলায় যে মানুষগুলি নাকানি-চোপানি খাচ্ছে তাঁদের সত্তর ভাগই মহিলা। এবং জগৎব্যাপী উইমেন্স লিব আন্দোলনের মাঝখানেও এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এমনতর ফেমিনাইজেশন অব পভার্টির পাশাপাশি উইমেন্স লিবের শৌখিন পাঁয়তারা নিষ্ঠুর পরিহাসের মতো ঠেকে।

কথা হচ্ছিল ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম, বিবাহ, পুরুষ-সংসর্গ ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে এই ভদ্রমহিলা শক্ত হাতে মোকাবেলা করার পর সেসবকে অতিক্রম করে চলে যেতে পেরেছিলেন দূর-দূর ক্ষেত্রে। এই গবেষণা-কর্মের কল্যাণে আমরা সেসবের সবিস্তার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি। অনামিকার মনে হয়, 'ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সম্পর্কে বাঙালীদের প্রচলিত ধারণাটাও বড্ড সংকীর্ণ, সীমিত। ঐ কপোত-বিবরবদ্ধ ধারণাটার চাইতে তিনি যে অনেক বড়' একথাটা আমাদের কারুর-কারুর সম্পূর্ণ অজানা হয়ত ছিল না। কিন্তু কতটা যে বড়ো তার পরিচয় এতদিনে ঠিকমতো পাওয়া গেল। 'ভিকতোরিয়া ওকাম্পো শুধুই রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাদাত্রী হিসেবে নয়, আপন প্রতিভা ও কীর্তির জোরেও বাঙালীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি দাবি করতে পারেন'—এই উক্তির সমর্থনে তাঁর কর্ম ও কীর্তির দীর্ঘ তালিকা পেশ করা হয়েছে। 'নারীমুক্তি-সংগ্রামী ফেমিনিস্ট ভিকতোরিয়া, স্বাধীনতা-পিপাসু স্বাধীনতাসংগ্রামী ফ্যাশিজম-বিরোধী ভিকতোরিয়া, সাহিত্যরসিক সংগীতরসিক শিল্পরসিক আবৃত্তিকার অভিনেত্রী হতে চাওয়া লেখিকা ভিকতোরিয়া, সমুদ্রপ্রেমিক বৃক্ষপ্রেমিক ক্যাকটাসের সমঝদার ভিকতোরিয়া, আলোক-পিয়াসী মিস্টিক রবীন্দ্রভক্ত ভিকতোরিয়া, বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে সেতুবন্ধন ও বিশ্বজনীন সংস্কৃতির ধ্বজাবাহক ভিকতোরিয়া, সুন্দরী-লাজুক-সংবেদনশীল এবং তৎসত্ত্বেও "জাঁদরেল পুরুষমানুষ" ভিকতোরিয়া, অগণিত বিখ্যাত নরনারীর বান্ধবী ভিকতোরিয়া…' আর কত চাই? এত ধারায় নিজেকে ছড়িয়ে দেবার মতো যাঁর অপর্যাপ্ত প্রাণশক্তি ছিল নিঃসন্দেহে তিনি 'মুক্ত' নারীর একটি সম্পূর্ণ প্রতিমা। যদি অবশ্য রক্ত-মাংসের দেহে সম্পূর্ণতা লাভ করা সত্যিই সম্ভব হয়।

যাক, এবার গবেষণা থেকে উপন্যাসের দিকে তাকানো যাক। অবশ্য উপন্যাস আর গবেষণা হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গিয়েছে অধ্যায়ের পর অধ্যায়। অনামিকার কৃতী মনোরোগ-বিশেষজ্ঞ স্বামী রঞ্জনের অপঘাত মৃত্যুর পরেও সে কিশোর ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে ব্রিটেনেই থেকে যাবে ঠিক করে। বীমা ও ক্ষতিপূরণের টাকায় হিসেব করে চললে ব্রিটেনের অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও তাদের কুলিয়ে যাবে। তা ছাড়া আত্মসম্মান বজায় রেখে নিজের মতো করে বাঁচবার স্বাধীনতা এ সমাজে বেশি, এবং অনামিকা নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছে বরাবর। অতএব দেশে আত্মীয়স্বজনের মাঝে না ফিরে যাওয়াই ঠিক করল।

'অনেক দিন আগে কলকাতায় অনামিকা যখন ছিল তুলনামূলক সাহিত্যের ছাত্রী, তখনও অসাহিত্যিক নানান বিষয়ে কৌতূহল ছিল তার। রঞ্জনের সান্নিধ্যে বিশুদ্ধ সাহিত্যের জগৎটাকে ক্রমশ পিছনে ফেলে এসেছে।…এখন তার সাহিত্যচেতনা বৃহত্তর বিশ্ব-চেতনারই অন্তর্ভুক্ত।' বর্তমানে সংসার ও সন্তান পালনের সঙ্গে-সঙ্গে পূর্বোক্ত অনুবাদ আর গবেষণার কাজেই সে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছে। 'এই যে বিজয়াকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, এটা তো রুটির জন্য নয়, স্রেফ লেবার অফ লাভ।' তুলনামূলক সাহিত্য পাঠের সূত্রে কলকাতায় থাকতেই ফরাসি ও জর্মান শিখেছিল। তারপর নিজের তাগিদে ক্রমশ এগিয়ে গিয়েছিল স্প্যানিশ ও তার উপভাষা লাদিনোর দিকে।

অনামিকার শুভানুধ্যায়িনী বয়োজ্যেষ্ঠা বান্ধবী এমিলিয়ার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়েছিল রঞ্জনের রোগিণী হিসাবে। এখন এই বান্ধবীই সব ব্যাপারে তার সবচেয়ে বড়ো সহায়। লাদিনো থেকে অনুবাদের কাজেও সাহায্য করেন, আবার গবেষণার ব্যাপারে নানাভাবে সক্রিয় সাহায্য করেন—কখনও ছেলে-মেয়ের দায়িত্ব নিজের উপর টেনে নেন। এবং দেখা গেল অনামিকার অকাল বৈধব্যের নিঃসঙ্গতা দূর করবার জন্য তিনিই তাকে একটু ঠেলে দেন পূর্ব-পরিচিত অশনির দিকে। অশনিও ইয়োরোপে অভি-বাসী বাঙালি। ওলন্দাজ স্ত্রী এবং কন্যাসহ একটি সংসার আছে বটে আমস্টারডামে। কিন্তু কাজের সূত্রে ইয়োরোপের নানা জায়গায় তাকে থাকতে হয়। আপাতত অশনি বেশ কিছুকাল একাকী লনডন-বাসী।

ভিকতোরিয়া ওকাম্পো বিষয়ে তথ্যের সন্ধানে টটনেস-সংলগ্ন ডার্টিংটন হলে যেতে হয় অনামিকাকে। শ্রীনিকেতন গড়ে তোলার কাজে রবীন্দ্রনাথের দক্ষিণ-হস্ত ছিলেন যে লেনার্ড এলমহার্স্ট তিনিই আবার রবীন্দ্রনাথের আর্জেনটিনা সফরে তাঁর সচিব ও সহচর ছিলেন। তাই ওকাম্পো-রবীন্দ্রনাথ রূপকথায় এলম্-হার্স্টেরও একটা বড়ো ভূমিকা ছিল। কবির সান্নিধ্যে যে জীবনদর্শন আয়ত্ত করেছিলেন এলম্হার্স্ট তাই পরে রূপ পেয়েছিল তাঁর এই গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানে। তাই অনামিকার আরব্ধ গবেষণাসূত্রে ডার্টিংটন হলে যেতেই হয় মূল্যবান তথ্যের সন্ধানে।

দেখা গেল এ সময়েই ঘটনাচক্রে অশনিও পৌঁছে গিয়েছে ওই অঞ্চলে। ঠিকানা এবং উৎসাহ অবশ্যই এমিলিয়া জুগিয়েছিলেন। রঞ্জনের মৃত্যুর পর সেই প্রথম ছেলেমেয়েদের ছেড়ে অনামিকার বাইরে আসা। অশনির সঙ্গে ইতিপূর্বে কিছু অন্তরঙ্গ পত্রবিনিময় এবং বন্ধুত্ব হয়েছে। অভ্যস্ত সংসারজীবনের বাইরে তার ইনটেলেকচুয়াল কাজকর্মের মাঝখানে হঠাৎ অশনির আবির্ভাব তার মুক্তির আর-এক দিগন্ত খুলে দেয়।

এর পর ঘটনাক্রত গড়ায়। সারাদিন এলম্হার্স্ট রেকর্ডস্ অফিসে কাজ করার পর একদিন সন্ধ্যায় অশনির সঙ্গে স্প্যানিশ রেস্তোরাঁয় গিয়ে পানভোজনের পর প্রচণ্ড মাথা ধরে অনামিকার। অত রাত্রে দেখা যায় অশনির হোটেলের ঘরেই শুধু পাওয়া সম্ভব মাথাব্যথার জন্য অ্যানাডিন যা না পেলে সে মরেই যাবে মনে হয়। অতএব দশ মাইল পাড়ি দিতে হয়। তবে গাড়িতে যেতে-যেতে অত 'সাংঘাতিক' মাথাব্যথা নিয়েই অশনির পাশে বসে একটি 'দারুণ মিষ্টি' লাদিনো লোকগীতি গেয়ে শোনায় অনামিকা। বাঙলায় তার অনুবাদটাও শুনিয়ে দেয়:

চাঁদের আলোয় এক রাতে
বেড়াতে গিয়েছিলাম;
দেখলাম এক ছোকরাকে,
আঁখি ঠারলো সে আমাকে
তখনই কাফেতে টেনে নিলো
দুটি ছোট্ট চুমু দিয়ে দিলো

জোর কদমে এগিয়ে যায় প্রত্যাশিত ঘনিষ্ঠতা—শুধু যা অপ্রত্যাশিত তা হল: এইখানে বইয়ের ছাব্বিশ অধ্যায়ে এসে হঠাৎ সাধু ভাষার ব্যবহার!

কেন? ব্যাপারটাকে যেন কেউ লঘু বলে মনে না করে? আটপৌরে বাঙলা ভাষায় 'রহঃকেলি'-র প্রতিশব্দ কি অশ্লীল শোনায় তাঁর কানে? স্ত্রী শব্দটা যেসব বাঙালি ভদ্রলোকদের কানে অশ্লীল ঠেকে তাঁরা তাঁদের 'ওয়াইফ' বলে উল্লেখ করেন দেখি। এখানে ঘটনা ও বর্ণনায় যে-কবিতা যে-পবিত্রতাদাবি করেন লেখিকা আমার মনে হয় তার জন্য তৎসম শব্দের ব্যবহার আবশ্যিক ছিল না।

এদিকে অনামিকার মনে হয়: 'যে-দৈব বেল-ফাস্টের একটি রেস্তোরাঁতে রঞ্জনের উপর শেলবর্ষণ করিয়াছিল, সেই দৈবই টটনেসের একটি রেস্তোরাঁতে অনামিকাকে অশনির সান্নিধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া দিল।' দেখা যাচ্ছে ইমানশিপেটেড মহিলারাও প্রয়োজনমত দৈবের উপর খানিকটা দায়িত্ব চাপিয়ে আরাম বোধ করেন। অবশ্য এক্ষেত্রে 'অনামিকার বোধ হইল সে সত্যই স্বাধীন ও আধুনিক নারী কিনা, সহসা তাহার কঠিন পরীক্ষার লগ্ন উপস্থিত হইয়াছে। সে তাহার অন্তরের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া পরম্পরাগত কোনো নিষেধের সংকেত খুঁজিয়া পাইল না। বস্তুত অশনির সহিত রাত্রিযাপনের আইডিয়াটির প্রতি সে কোনো বিকর্ষণ অনুভব করিল না শুধু তাহাই নহে, বরঞ্চ আকর্ষণই অনুভব করিল।' ভালো কথা।

তবে রজনীশেষে অশনির আচরণে কিছুটা অশোভন (অথবা সাবধানী?) তাড়া ছিল। তাই অনামিকা অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বলে, 'কাল রাত্রে তোমার কাছে থাকিতে বলিয়াছিলে। থাকিয়াছি। যেই ভোর হইয়াছে, তোমার প্রয়োজন মিটিয়াছে, অমনি আমাকে তাড়াইয়া দিতেছ, ঘরের বাহির হইবার জন্য তাড়া দিতেছ।'··· একজন স্বাধীন আধুনিক মহিলার মুখে এই অভিমানের ভাষাটা আমার কানে বেশ বেমানান ঠেকছে। প্রয়োজনটা কি শুধু একতরফা অশনির ছিল? সে কি কোনো নাবালিকাকে ফুসলিয়ে এনে ঘরে তুলেছিল? এই ভাষায় যে মহিলা-জনোচিত প্রতিন্যাসটা ধরা পড়ছে তা যে আবহমান কালের সেই নারীর যে-নারী পুরুষের দ্বারা ব্যবহৃত হয়—তাকে ব্যবহার করার শক্তি ধরে না। অনামিকা কি সেই-জাতীয়া?

সে রাত্রে অশনির শয্যায় অংশগ্রহণ করে তার অনেক প্রাক্তন অভিজ্ঞতাই অনামিকা জেনে নিয়েছিল। জীবন-জীবিকা, নারী, স্ত্রী, আত্মজা ইত্যাদি বহু ব্যাপারেই অশনি নিজেকে অসঙ্কোচে যতটা প্রকাশ করেছিল তাতে অনামিকার চোখে মোহ-অঞ্জন লাগার কোনো কারণ ছিল না। সকাল বেলায় কথায় কথায় অনামিকা তাকে 'ধুরন্ধর নাগর' বলে অভিহিত করায় অশনি উল্লসিত হয়ে জানায়, 'অতীতে আমি সত্যিই পারদর্শী প্রেমিক ছিলাম। রমণীগণ আমার রতিকুশলতার কত প্রশংসা করিত।' অতএত বোঝা গেল যে এটা দুজন প্রাপ্তবয়স্ক আধুনিক মানুষের সহজ স্বাভাবিক মোহমুক্ত সৌহার্দ্য-বিনিময়। অথবা অনামিকার ভাষায় হয়তো 'টেনডারনেসের' পারস্পরিক প্রয়োজন মেটানো। তবে তারও একটা অভিভব, একটা মুগ্ধতা কখনও-সখনও থাকতেই পারে বলে অনুমান করি। কিন্তু অনামিকার বেলায় গত রাত্রির সুরটা কেটে যায় অশনির প্রভাতী ব্যস্ততায়।

তাই দুর্বোধ্য ঠেকে অনামিকার বিষণ্ণতা। ঘণ্টা খানেক পরে নিজের হোটেলে বসে সামনে কফি নিয়ে প্রাতরাশের অপেক্ষা করছে—অশনি তাড়াহুড়ো করে তাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। তখনও তার স্নান ও কাপড় পালটানো হয় নি বলে অধোবাসে অস্বস্তিকর সিক্ততা অনুভব করছে। জানলার বাইরে তখন বরফ পড়ছে। অনামিকা সেদিকে তাকিয়ে আপন মনে আবৃত্তি করে:

I think
love is like that; merciful as snow
bandaging the bruised earth,
while making the green grow.

আধুনিকারাও এত অল্পে 'bruised' হন? আর

এখানে আর-একবার সেই 'too often profaned' শব্দটির ব্যবহারে আমার সেকেলে মন হায় হায় করে উঠল।

এরপর কাহিনী যে-মোড় নেয় তা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত না হলেও অনামিকা এবং পাঠকদেরও একটু বিমূঢ় করে বইকি! কিছুকাল পরে অনামিকার আগ্রহাতিশয্যে অশনি জানায় যে সামনের ছুটিতে তারা নিজের নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্রাইটনে কয়েকদিন একসঙ্গে ছুটি কাটাতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে স্পষ্ট লেখে: 'আমার শুভেচ্ছা হোক তোমার পাথেয়। তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়ে তুমি সুখী হও। কিন্তু আমাকে তুমি বিছানায় পাবে না।' তবু যথাসময়ে যথাস্থানে অশনি এসে যোগ দেয় কন্যা বাঁশিকে নিয়ে। সেই সঙ্গে তার নতুন শয্যাসঙ্গিনী আধা-ওলন্দাজ আধা-ইন্দোনেশিয় মারগ্রীটকে নিয়ে আসে—তার বয়স এমন যে প্রথমে মনে হয় বাঁশিরই বন্ধু বুঝি। তবে নাবালক কিশোর-কিশোরীদেরও বুঝতে দেরি হয় না। অথচ এরই মাঝখানে ধুরন্ধর নাগর অনামিকাকে ভরসা দেয়: 'আমার মন কি বলছে জানো? বলছে, তোমার সঙ্গে আমার ভারী সুন্দর একটা কিছু হবে,—ভবিষ্যতে···এখন তারই টিউনিং আপের সময়। সেই তার বাঁধায় তোমার সহযোগিতা লাগবে।'

এবার অনামিকার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে, 'তাহলে অত তাড়াহুড়ো ক'রে আমাকে শোয়ানোর কী দরকার ছিল? আমি কি তোমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বলেছিলাম, আজ রাত্রে তোমার ঘরে একটু ঠাঁই দাও অশনিদা?' হায় খণ্ডিতা নারী! আধুনিক স্বাধীন রমণীর গুমর এত সহজে খানখান হয়ে গেল? চিরকালের এক্‌স্‌প্লয়টেড সামান্যা মেয়ের মতো কপালে করাঘাত। পড়তে যে লজ্জা করে! কিন্তু এর পরেও নাকি অশনি তাকে 'বিশাল এক তীর্থে নিয়ে যেতে' চায়। 'যেখানে সহজ আর কঠিন, ক্ষণিক আর চিরন্তন, অর্ডিনারি আর মিরাকুলাস ইত্যাদি বৈপরীত্যকে' সে মেলাবে। তার জন্য অনামিকাকে কিছুটা পথশ্রম স্বীকার করতে হবে। এমন মহৎ প্রত্যাশা জাগাবার পর যে যার ঘরে শুতে যায়। কিন্তু একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ভোররাতে জেগে উঠে বাথ-রুমে যায় অনামিকা। দেখে, 'টয়লেটের জলে একটা জন্মনিরোধক ভাসছে।' অনামিকা চোখ বন্ধ করে একটা 'বিস্ফোরক শোক সবলে অবদমন করে বাথরুম ব্যবহার করে বেরিয়ে আসে।' এতটাই কি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া দরকার ছিল অনামিকাকে!

কিন্তু বুঝতে পারি না, অনামিকার আশা করার ক্ষমতা অসীম, না তার নিরবুদ্ধিতা। তাই 'অশনি যে ঠিক কী চায় তা এখনও অনামিকার কাছে তেমন একটা স্পষ্ট না। তবুও তার মনে হয় যে অশনিও তাদের সম্পর্কটাকে সুন্দরতর সমৃদ্ধতর করে তুলতে চাইছে।' ···আবার মনের কোণে সে অনুভব করে অশনির ব্যবহারের মধ্যে কোথায় যেন একটা ফাঁকি-বাজি থেকে যাচ্ছে, যা প্রকৃত সৌহার্দ্যের পরিপোষক নয়।

এরপর উপন্যাস শেষ হতে আর খুব দেরি হয় না যদিও অবশ্য বইয়ের অর্ধেকের বেশি জুড়ে আছে এই পরগাছা। ব্রাইটনের শোকাবহ অভিজ্ঞতার পরেও অনামিকা আশা ছাড়ে না। কিছুকাল পরে আবার চিঠি লেখে। অশনি ভদ্রলোক। সে সংক্ষিপ্ত হলেও সর্বদা চিঠির জবাব দেয়। এবারে জানায় যে সে-ফুরসত পায় নি চাকরির নানা ধান্দায়। 'তবে সত্যি কথা বলতে কি আসল কারণটা অকারণ: মারগ্রিট। তার শান্ত গভীর লাবণ্য আমাকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভরে রেখেছে। এর বেশি আর কি বলার আছে।'

অনামিকার আছে, কারণ যথাস্থানে মানে-মানে নিরস্ত হওয়া তার স্বভাবে নেই। এবার সে দীর্ঘ পত্র লেখে। তাতে ফকল্যাণ্ড সংকট, স্বদেশে আর্জেনটিনার প্রতি ভিকতোরিয়ার মনোভাব ইত্যাদি আলোচনার সঙ্গে এমন কথাও জানায়, 'আমাদের বয়সে ভালো-

বাসাগুলিকে ওয়ান এ্যাট আ টাইম পদ্ধতিতে নিয়মিত করার কোনো মানে হয় না…' অতএব…।

অবশেষে অশনির দীর্ঘতম এবং তিরিক্ষি জবাব। বক্তব্য অতি স্পষ্ট: 'এত জ্ঞান দাও কেন বল তো? আমি কাকে কখন কিভাবে ভালোবাসব তা কি শুধু আমারই কনসার্ন নয়? ….তোমার যৌনতার ক্ষুধা আছে, মৌনতার ক্ষুধা নেই। ঐখানেই তোমার সাথে আমার মস্ত প্রভেদ। এবং সেজন্যেই তোমার আমার সংলাপ এ জন্মে সম্ভব নয়।…

…আর ভালো লাগছে না। আর কথা বাড়াতে চাই না, আমি থামতে চাই। '

আমরাও কি চাই না? আমাদেরই কি ভালো লাগছে? তবু আরো একটু কথা বলা বাকি থাকে উপন্যাস বিষয়ে। কারণ ইতিপূর্বে ব্রাইটন থেকে ফেরার অল্প পরেই শুভেচ্ছাবাহী কার্ড পাঠিয়ে অনামিকা অশনির কাছ থেকে একটি 'সংক্ষিপ্ত নোট' পেয়েছিল। তাতে ছিল, 'তোমার কি মনে হয় না, মিশা, যে বিরহের বাঁশি, মিলনের বাঁশির চাইতেও বেশি মধুর, বেশি নিবিড়?' এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্লেষণ করতে বসে অনামিকা মন্তব্য করে: 'রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই যে একটা বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ বিরহের cult—হ্যাঁ কাল্ট ছাড়া আর কী বলা যাবে একে, অশনি কি একে নিজের অন্তঃস্থ করে নেয় নি? আমাকেও কি তাতে যোগ দিতে বলছে না? ব্যাপার কী? যার এককালে প্রতি সপ্তাহে একটি নতুন শয্যা-সঙ্গিনী লাগতো, সে কি এখন কবিগুরুর মতন বিরহ-বেদনা মন্থন করে কবিতা লিখতে চায়?'

উপন্যাস ও গবেষণা সমান্তরালে চলতে-চলতে এখানে এসে পরস্পরকে আর-একবার স্পর্শ করে। আগেও করে নি এমন নয়। কিন্তু এখানে এসে আমার ধৈর্যচ্যুতি হয়। একে যদি অসহ্য ধৃষ্টতা বলে আমার মনে হয়ে থাকে তবে কেতকী এবং তাঁর মুগ্ধ পাঠকরা নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করবেন না। তবে অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ বলে সান্ত্বনা পেতে পারেন। কিন্তু যেখানে বিচারটা নান্দনিক সেখানেও আমি নীতি-বিশুদ্ধতার গজকাঠি নিয়ে বসেছি এমন অপবাদ আমি স্বীকার করব না। এবং এমনতর ধিক্কার শুনেও অনুতপ্ত হব না। আমার কষ্ট হয়েছে এই জন্য যে এমন সংবেদী লেখিকার কাছ থেকে আমি আর-একটু সফিস্টি-কেশান প্রত্যাশা করেছিলাম। এযুগে লঘুগুরুজ্ঞানের অভাব নিয়ে গঞ্জনা দিলে সেটা পরিহাসের ব্যাপার হয়ে যায়। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতায় এবং সাহিত্যের দৃষ্টিতেও আমরা কি স্থূল আর সুকুমারে তফাত করব না। কোন্ সংবেদনাটা খাঁটি আর কোন্‌টা মেকি তারও বিচার করব না? পরিমিতিবোধ না হয় নাই দাবি করলাম, কিন্তু বুদ্ধির বিচারেও কি সবই তুল্যমূল্য?

এবারে বলি যে, যেমন করে 'দোস্তী রোটির' পরত দুটি সাবধানে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয় তেমনি করে এই গবেষণাকর্মকে উপন্যাস থেকে পৃথক করে যখন দেখি মুগ্ধ হই। পৃথক করার কষ্ট স্বীকার করতেই হল এবং কী বস্তু যে এই গবেষণার গায়ে লেপটে দেওয়া হয়েছে তার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেও দেড় হাজারের বেশি শব্দ ব্যবহার করতে হল। কয়েকটি উদ্ধৃতি দেবার সময় আমার কলম সরছিল না, তবু শেষ পর্যন্ত দেওয়াই ঠিক করলাম—কারণ মনে হল স্পষ্ট করে উচ্চারণ করাই ভালো কোথায় আমার আপত্তি। রবীন্দ্রনাথ আর ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সমান্তরালে অশনি-অনামিকার যে কাহিনী কেতকী পরিবেশন করেছেন তা কাল্পনিক হোক, আত্মজৈবনিক হোক, কিছু আসে যায় না। কিন্তু ওই কাহিনীর স্থান ওখানে হতে পারে না—যৌক্তিক, নান্দনিক কোনো বিচারেই। পাঠক-কে ওই বস্তু গলাধঃকরণ করিয়ে লেখিকা কৃতজ্ঞতা-ভাজন হন নি।

সত্য যে মাঝে-মাঝেই কল্পকাহিনীর চেয়েও বেশি চিত্তহারী হয়, একথা কেতকীর অজানা নয়। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই স্বল্পজ্ঞাত কাহিনীটি তার মানবিক-সাহিত্যিক আবেদনে কী অসম্ভব সুন্দর তা কেতকীর চেয়ে বেশি আর কজন জানেন? তবুও এই বইয়ে খাদ মেশাতে হল?

সত্য কাহিনীটি প্রথম থেকেই খুব নাটকীয়। একেবারেই অপ্রত্যাশিত অপরিকল্পিত এই পরিচয় সম্বন্ধে বলাই যায়, 'কী ছিল বিধাতার মনে।' তবে 'রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনে যত নারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ভিকতোরিয়া ওকাম্পোই ছিলেন ব্যক্তিত্বে কৃতিত্বে বুদ্ধিবৃত্তিতে শিল্পবোধে রবীন্দ্রনাথের উচ্চতার সবথেকে কাছাকাছি'—এ বিষয়ে দ্বিমত হবার আশঙ্কা না থাকলেও সত্যের খাতিরে মনে রাখা ভালো যে, 'ছিলেন' না বলে 'হয়ে উঠেছিলেন' বললে আরো যথার্থ হয়। কারণ ১৯২৪-এ যখন প্রথম পরিচয় হয় আর্জেনটিনায় তখনও ভিকতোরিয়া খুব কিছু হয়ে ওঠেন নি। তবে একটা প্রস্তুতিপর্ব, একটা ভাঙাগড়া যে চলছিল তাঁর জীবনে তা হয়তো টের পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩০ সালে ইয়োরোপে যখন শেষবারে দেখা হয় তখন আরো পরিণত, আরো প্রত্যয়সম্পন্ন একজন মহিলাকে পেয়েছিলেন যিনি অবলীলায় চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথকে রাতারাতি প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন প্যারিসের রসিক সমাজে। কিন্তু ভিকতোরিয়ার যে শ্রেষ্ঠ সার্থকতা তা তখনও দূরে। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রবাসের দিন যিনি মাধুর্য-সুধায় ভরে দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রচৈতন্যে যাঁর স্থায়ী অবস্থানের স্পষ্ট স্বাক্ষর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে পর্যন্ত তাঁর কাব্যে পাওয়া গিয়েছে:

বিদেশের ভালোবাসা দিয়ে
যে প্রেয়সী পেতেছে আসন
চিরদিন রাখিবে বাঁধিয়া
কানে কানে তাহারি ভাষণ।

তাঁকে কৃতী মহিলা হতেই হবে এমন কোনো প্রয়োজন নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে ছিল না। রবীন্দ্রনাথের "নারীভাবনা" নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন কেতকী, মনোজ্ঞ এবং উপভোগ্যও। সর্বত্র হয়তো বিতর্কের ঊর্ধ্বেও নয়। কিন্তু সে প্রসঙ্গ আপাতত থাক। এই বিশেষ নারীতেই ফিরে আসি।

যে-দুমাস বুয়েনোস আইরেসে রবীন্দ্রনাথ এল্‌ম্‌হার্স্ট সহ ভিকতোরিয়ার আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন, সেই দুই মাসেই একটি জীবনব্যাপী সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা হয়ে গিয়েছিল ঠিকই—কিন্তু এই সম্পর্ক গড়ে ওঠার ব্যাপারটা খুব মসৃণ ছিল না। ভাষা, সংস্কৃতি, বয়স, অভিজ্ঞতার পটভূমি ইত্যাদির বেড়া ডিঙিয়ে তিনটি মানুষের সম্পর্ক যে টানাপোড়েনে বোনা হচ্ছিল, তার অতি উপাদেয় বর্ণনা পেয়েছি আমরা এই বইয়ে। 'অনেক মানবিক সম্পর্কের মতো ভিকতোরিয়া ও রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কেও যে আলো আঁধারি ছিল' তার উপর তীব্র সার্চলাইট ফেলে অনেক কিছুই আমাদের চোখের সামনে তুলে এনে দিয়েছেন লেখিকা। কখন-সখনও গবেষণার সীমা ছাড়িয়ে জল্পনায় হয়তো চপলতার স্পর্শও লেগেছে (ভিকতোরিয়া আর এল্‌ম্‌হার্স্ট 'মুসলমান হয়ে গিয়ে বিয়ে করতে পারতেন' কিনা কিংবা যদি ওঁরা দুজনে আইনের ধার না ধেরে এবং ও-সমস্ত ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে স্রেফ শান্তি-নিকেতনে এসে 'লিভ টুগেদার' করতে চাইতেন তাহলে ওঁদের ঘটক তথা গুরুদেব সে ব্যবস্থা অনুমোদন করতেন কি?')। কিন্তু যেভাবে এই তিন ব্যক্তির জটিল বহুতল-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাকে গভীর মমতা, অন্তর্দৃষ্টি এবং বুদ্ধির সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন লেখিকা। কার কোথায় বাধা ছিল, কোথায় যে প্রতিহত হচ্ছিল ত্রয়ী সম্পর্কের ঋজুধারা, তার হৃদয়-গ্রাহী বুদ্ধিগ্রাহী বিশ্লেষণ আমরা পেয়েছি। এই কাহিনী যে শেষ পর্যন্ত এক ট্র্যাজিক মাত্রা পায়, তার মূলেও আমরা পৌঁছাই অত্যন্ত ইনটারেস্টিং এই চরিত্রগুলির সম্বন্ধে সদ্য-উদ্‌ঘাটিত কিছু তথ্যের সাহায্যে। সেজন্য লেখিকাকে ধন্যবাদ জানাই।

সিস্টার নিবেদিতা কিংবা মীরা বেনকে ভারতীয় মন সহজে বোঝে এবং শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়। ভিকতোরিয়া অন্য জাতের মহিলা। আধুনিক যুগের জটিল

সংঘাতে গড়া—যদিও কালের দিক থেকে এঁরা পরস্পরের খুব একটা দূরবর্তী নন। ভিকতোরিয়াকে সম্পূর্ণ করে জানতে হলে অবশ্যই "রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে" যেতে হবে। কিন্তু মনে একটু খেদও থাকে। হীরে ফেলে যে আঁচলে কাঁচ বাঁধে, তাকে আমরা করুণা করি। কিন্তু যে হীরে আর কাঁচ দুয়েরই বেসাতি করে এবং হারের সাথে কাঁচও গছিয়ে দিতে চায়, তাকে কী করব?

শেষ অংশ আগামী সংখ্যায়

রবীন্দ্রনাথ ও ভিকতোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে—কেতকী কুশারী ডাইসন। নাভানা। এপ্রিল ১৯৮৫। ষাট টাকা।

In your Blossoming Flower-Garden—Ketaki, Kushani Dyson, Sahitya Akademi, 1988. Rs. 100

যে আছে মাটির কাছাকাছি

রকিবউদ্দিন ইউসুফ

ভোর হয়েও হয় নি শেষ পৌষের এই দিনটির।

কুয়াশার চিটচিটে শুভ্রতার মধ্যে বিরক্তিকর ঠেকছিল প্রকৃতিকে। আর এক দীর্ঘসূত্রী জড়তা গেঁটেবাতের মতো ঝিম ধরে ছোট্ট কুটির আর আঙিনা-টুকুকে আতুর করে রেখেছিল।

কোন্ ভোরেই একটা শালিক ঝুরঝুরে চালায় এসে বসেছিল। টুপ করে একটা পালক খসার শব্দে উঠোনের মাঝখানে বসল এসে। শায়ের দেখল। দখিনদোরি ঘরের দাওয়ায়, খুঁটিতে হেলানো শরীর। একটা জীর্ণ কম্বল গলা থেকে নীচের অংশটুকুকে গুটিয়ে রেখেছে। ডান হাতের আধপোড়া বিড়ির আগুন আর ক্ষীণ ধোঁয়ার মধ্যে কী এক ভাবনার লুকোচুরি চলছিল।

—অ, তুমি উসরায় বসে আছো?

মাথা হেলিয়ে বাঁ কাতে ঘাড় ফেরাতে চেষ্টা করল শায়ের। খুঁটিটাও নড়ে উঠল।

—কখন উঠে এসেছ?

বাঁশের বাতার চেগার-বসানো দরজার পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে জানেরা।

—এই কিছুখন আগে।

—লতুন কিছু বানালে?

—না গো, এখনো পুরা আকার পায় নি।

—এবার কোনো লতুন বোল বাঁধলে না?

—না জান, মন সরে না।

কেমন অস্পষ্ট শোনায় শায়েরের কণ্ঠস্বর। জানেরা তেমনিভাবেই পাল্লা ধরে দাঁড়িয়ে। বাইরের কুয়াশা উঠোন ছাড়িয়ে দাওয়াতেও উঠে এসেছে। দুজনের মধ্যে কুয়াশার পরদাটা কখনো হালকা, কখনো পুরু হতে থাকে।

—ওই যে বুললে—কী একটা পুরা আকার পায় নি···

—হ্যাঁ, উটা এবারের জন্যে লয়, শেষ বোল—শেষ কথা···

জানেরা নাড়া খায় মনে। দরজার কাছ থেকে

এগিয়ে এসে শায়েরের ঘনিষ্ঠ হয়। থুতনি ধরে ঝাঁকা দেয়: আমার কথার মান ধরে রেখেছ। সেই কথা এখনো ভুল নি গো—

শেষ পৌষের সূর্য এখনো না উঠলেও জানেরার চোখে অন্য সূর্য চিকমিক ছটায় উদ্ভাসিত হয়। সেই ভাকায় শায়েরের মন আলোয় ফোটা ফুলের মতো দুলতে থাকে।

—তুমি তো হক কথাটাই বলেছিলে, জান। আদরে টেনে নেয় স্ত্রীকে বুকের মধ্যে। বলে: তুমি যেমন আমার জেবনে সত্যি, তেমনি তোমার কথা জান। বিশ্বেস করো। একটা বছর ধরে আমি তোমার কথাকে নাড়াচাড়া করে দেখেছি। আমার বোল, সুর—সবই···

জানেরা শায়েরের মুখে হাত চাপা দেয় তাড়াতাড়ি—না, নাগো, ভুল আমারই হয়েছিল। লোকের কথা লোকের মুখেই মানায়—ও কথা আমার অন্তরের না। তুমি বিশ্বেস করো।

মা-বোনেরা খোলো আগল··· ভারবোল
একধামা চাল ন-টা পটল···ভারবোল

শেষ পৌষের ভোরের কুয়াশাকে দীর্ণ করে একঝাঁক ছোটো-বড়ো কণ্ঠ কলকল করতে-করতে শায়েরের আঙিনায় ঢুকে পড়ে।

—কই গো ওস্তাদ, অ্যাখুনো আগল খুলেন নাই?

—দেখছ না সেই কোন্ ভোর থেকে বসে আছি। ভাবছিলাম, এবার কি ভারবোলারা উচ্ছবের দিনটা ভুলে গেল বেবাক।

যে মোহ্যা (কুয়াশা), রাত কি দিন ঠাহরই হয় না। দলের একজন বলে।

—তা বটে, বশির। তবে দিনটাকে তোমরাই তো দিন করবে।

—মা-জানেরে দেখি না ক্যানে? আট বছরের বারেক উঁকি ছায় ঘরের দিকে।

—এই তো বাবাজী, তোমাদের তরে ভার আনতে ঢুকেছিনু···। জানেরার দুই ঠোঁটে হাসির সর। কপালে বিন্দু-বিন্দু স্বেদ। একটু আগের সুখানুভব যেন মুক্তো হয়ে ফুটেছে।

শায়ের জানের চোখে চোখ রাখতেই তার নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে ওঠে।

ভারবোলারা তাদের ডালায় কিছু চাল, আলু আর কটা পেঁয়াজ ঢেলে নেয়—পিত্যেক বারের মতো এবারও ওস্তাদের বাড়ি থেকেই শুরু হল।

—যদ্দিন বাঁচব, তাই হবে। লক্ষ্মীমাসকে আমিই আগে বরণ করব।

—তা উস্তাদ, ইবার কোনো লতুন ভার বাঁধেন নি গো?

—না করিম, এ বছর মাপ করো।

—পিত্যেক বার তোমার বোল দিয়ে বাজি মাত করি, ইবার কি হেরে যাব?

—আরে না-না, ওস্তাদের যেসব ভার জমা আছে—তার ধারেকাছে লাগে কোন্ বোলকারের ছড়া।

সঙ্গে-সঙ্গে দলের সবাই চনমনে হয়ে ওঠে—ঠিক, ঠিক।

দলটা আঙিনা থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে মকসেদ বলে সন্ধেয় কিন্তুক ফুঁসড়েতে (বনভোজন) থাকতি হবেগো, উস্তাদ। লোটাহারের মাঠে ইবার···।

ভারবোলাদের দলটা বেরিয়ে যেতেই কুয়াশা কেটে যেতে থাকল। যেন দিনটার শুরু তাদের অপেক্ষাতেই ছিল। শায়ের দাওয়া ছেড়ে উঠোনে নেমে এল। তারপর বেড়ার আগল সরিয়ে বাইরে রাস্তায় এসে তাদের কলকণ্ঠ শুনতে চেষ্টা করল। বুকটা কেমন টনটন করে। সে কি অন্যায় করল? প্রতিবার চার-পাঁচখানা করে ছড়া বানিয়ে দেয় সে। এবারই ব্যতিক্রম। তাই এই অভিমানের কথা সে বুঝিয়ে বলতে পারবে না তাদের।

পরক্ষণেই ভাবে, সে বোল রচনা না করলেই কি বাপ-ঠাকুরদাদের কাল থেকে চলে আসা এই ভারবোলের উৎসবকে সে একাই তুলে দিতে পারবে?

আর কে কী বলল, তার ভিত্তিতেই সে এমন ভাববে কেন? একটা 'কিন্তু' মাকড়সার লালার মতো তার বোধের চারপাশে জাল বুনতে থাকে।

হঠাৎই সেখপাড়ার মোড় থেকে সমবেত ধ্বনি ভেসে আসে। উৎকর্ণ হয় শায়ের। মকসেদ বলছে:

যে দিবে মুঠি মুঠি
তার হবে নাক কাটিবিটি
বল ভারবোল··· (সমবেত স্বর)
যে দিবে কাঠা কাঠা
তার হবে লালচাঁদ ব্যাটা
বল ভারবোল···

ভারবোলাদের দলটি পাড়া ছাড়িয়ে গ্রামান্তরে চলে গেছে হয়তো। তবুও, তখনো অজস্র ভ্রমরগুঞ্জনের মতো "ভারবোল" ধ্বনিটি তার মর্মে আলোড়ন তুলছিল।

—এসো, চা খাবে।

ঘাড় ফেরায় শায়ের—চলো আসছি।

হাঁটু ধুলোর গাঁয়ের সরানে একগুচ্ছ নিরাভরণ পায়ের ছাপ তখনো জীবন্ত। প্রায় আতুল, হা-ঘরে, দীন-মজুর চাষপোলাদের মুখগুলি চকচক করে ভেসে ওঠে চোখের সামনে। আবহমান চাষি-সমাজের একটা পালাকে যারা আজো পরম নিষ্ঠায়, ভালোবেসে ধরে রেখেছে। কালের ভূমিদাস যারা—যাদের ভূমির শ্রম লেগে আছে সারা অঙ্গে, নেই সেই ভূমির স্বত্ব। তারাই, হ্যাঁ, তারাই সেই স্মরণাতীত পূর্বপুরুষকে, তার ভূমিজ লৌকিক উৎসবকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কী নিষ্ঠুর বৈপরীত্য! যারা মূল মালিক, তারাই কিনা আজ এই দিনের পার্বণকে চোখ ঠারে!···

*

গত রাতের শুকনো রুটি র-চায়ের সঙ্গে চুবিয়ে খাচ্ছিল শায়ের। জানেরার চা খাওয়ার অভ্যেস নেই। নুন-লঙ্কা-পেঁয়াজ মাখিয়ে সেও দাঁতে দাঁত চিবোচ্ছিল। দুজনে মুখোমুখি।

—আজকাল কী ভাব অত?

—কই না তো! আসলে আজকাল তুমি সবকিছুই খুঁটিয়ে দেখ। যা লয় তাই ভেবে বস। বাতিক এটা—বুঝলে, জানেরা, সব মানুষই তো কিছু না কিছু ভাবে।

—তোমার সাথে কথা বলাই পাপ।

—এই রাগটাও তোমার হুটহাট দেখছি আজকাল।

—ঠিক আছে, আর কিছু জিগাব না। বোবা হয়ে থাকব।

শায়েরের হাসি পেল। শেষ টুকরোটা মুখে পুরে চিবতে-চিবতে বলল—তুমি সেই ছোট্টো জানেরাই হয়ে আছ।

—আর তুমি বুঝি দাদো হয়ে গেছ?

—তা লয়তো কী। ছাখো, চোখ কোটরে ঢুকেছে, কপালে চারটে ভাঁজ পড়েছে—আর জিরজিরে ধড়টা সটিঙে তালগাছের মতো। সত্যি, তোমার কাছে খুবই বেমানান গো আমি। শায়েরের গলা জড়িয়ে যায়।

—ভালো হবে না বলছি। আমি পালিয়ে যাব ···জানেরা চুল ছিঁড়তে থাকে শায়েরের।

শায়ের জানেরার হাত চেপে ধরে। বলে: লক্ষ্মী মেয়ে, এবার একটা সুখবর দিই।

জানেরা কোনো কথা না বলে ড্যাবডেবিয়ে চেয়ে থাকে স্বামীর চোখের দিকে।

—আসছে শুক্রবার চলো যাই, খানজাহান পীরের দরগায়। খুব জ্যান্ত থান নাকি, সবাই বলে।

জানেরার চোখ দুটো ঝিলিক মারে। তারপর একটা ঢোক গিলে বলে: না, কত থান, জড়িবটি তো হল—আর ভাল্লাগে না। সে শায়েরের ঘাড়ে থুতনি ঘষে।

—শায়ের আছো—। তক্ষুনি বাইরে থেকে কার ডাক ভেসে আসে। জানেরা ধড়মড় করে আঙিনায় নামে। বাসি ঘরদোর সাফ করতে মন লাগায়। শায়ের জবাব ছায়: হ্যাঁ, আসুন।

দাঁতন করতে-করতে রৌশন মুন্সী আঙিনায় এসে

দাঁড়ায়। একমাথা বাবরি চুল। দাড়িটা বেশ মানান করে ছাঁটা।

—বসুন, মুন্সীচাচা।

—আজ বোল গেয়ে ভার চাইতে যাস নি? মুন্সীর চোখে কৌতুক।

—না, শরীরটা জুত যাচ্ছে না···, তা কী মনে করে চাচাজী?

—বেলতলার মাঠে গমের ভুঁইটায় হ্যাটকা হয়েছে, দুটো মুনিষের কাম ছিল···, খুব শক্ত কাজ নয়, আর কাউরে দেখে যা না···

—না, চাচা। এই ভারবোলের দিনে আমি কোনো কাজ করি না।

—ইটা আবার কেমুন কথা হল? হাদিশ-কুরানে কি কোথাও লেখা আছে—এদিনে কাম বন্ধ?

—অত হাদিশ-কুরান জানি না। ঈদের মতো এটাও একটা পালা বটে। আমরা চাষি লোক, বাপ-চোদ্দপুরুষেরা এ দিনটায় আনন্দ করত, আমরাও করি। এর বেশি কিছু জানি না।

—এসব বেদাতি (কুসংস্কার), শায়েব। ইসলাম হচ্ছে গিয়ে টলটলে পানির মতো স্বচ্ছ ধর্ম। তাতে কোনো কুটিকাটা নেই। বাপদাদারা কত কী করেছে বলে আমাদেরও করতে হবে? ধর্মকর্ম একটু ঘেঁটে ছাখ।

—মুখ্যু মানুষ, অত জ্ঞানগম্যি কোথায় বলেন!

—বিদ্যে না হয় নাই, কিন্তু ওইসব ছড়া বানাস ক্যামনে? গজল বানাতে পারিস না? মসজিদে, মক্তবে, মহফিলে সবাই গাইবে। এতে দ্বীনের কামও হবে—সুনামটাও বাড়বে। কইগো মা জানেরা—হক কইছি কিনা বলো। না তো যত্তো সব ভিক্ষের বোল···, ভাবিস এতে সুনাম হয়? লোকে হাসাহাসি করে, কেউ বাহবা দেয় না।

—চাচা—! শায়ের কঁকিয়ে ওঠে: আমি ভিক্ষের বোল বানাই?

—আহা-হা, চটিস কেনে, ওই হল, পরের দোরে-দোরে সুর গেয়ে ভার চাওয়াতে তোরা আনন্দ পাস একভাবে, গেরস্তরা মজা পায় অন্যভাবে···

শায়ের হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। ভাবান্তর দেখে মুন্সীজী হকচকিয়ে যায়। জানেরার উদ্দেশে বলে: ছাখো মাজান, কারো দেলে আঘাত দেওয়া আমার ইচ্ছে নয়—কিন্তু যা সত্যি, তা বলায় ঘাট কোথায় বুঝি না।

—আপনি আসুন, মুন্সীচাচা।

—হ্যাঁ, যাই দেখি, দুটো মুনিষ পাই কিনা। ভারবোলের দিন। ওস্তাদ যখন কামে নারাজ—তখন সাগরেদরা তো না করতেই পারে। বুঝি না, মানুষ ধর্ম থেকে কতদূরে। মুসলমানি নাম রাখলেই যদি মুসলমান হওয়া যেত, তাহলে তো···তওবা-তওবা।

—মুন্সীজী আপন মনে বিড়বিড় করতে-করতে বেরিয়ে যায়।

*

বকরি দুটোর জন্য ঘাস তুলে আনার নাম করে বেরিয়ে পড়ে। আসলে নিজেকেই মুক্ত করে শায়ের। জানেরা কাঁথায় ফোঁড় দিতে বসল—বড়ো একা মনে হচ্ছিল তার। শীতের চৌপর ঠাঁই বসে ঝিমুনির চেয়ে নানান কথার হুলগুলো তাকে বড়ো বেশি দংশন করছিল।

চাদরটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে ছোটো ভৈরবের ধার ঘেঁষে কিছুটা গিয়ে পুবের মেঠো আলিপথ ধরে। জামতলা, শিমুলতলা পার হয়ে বিটুর বিল। বিল পেরিয়ে উঁচু ডিহি মাদারি মাঠ। তারপরই ঢালু হয়ে নলডুবুরি বিলের শুরু। সূর্য পাটে নেমে গিয়েছিল। রাই, গম, মুসুর, অড়হর, কপি, আলু, পটল, বেগুনের খেতগুলো থরেবিথরে কে যেন সাজিয়ে রেখেছে। বাঘড়ি এলাকায় শীতকালে মা লক্ষ্মী ঢেলে দেন দু-হাতে উজাড় করে। এত সবুজ শস্য, ভার—তবুও মানুষ কেমন কৃপণ হয়ে উঠছে। আঁজলা গলে একবিন্দু জল ঝরে না!

নলডুবুরি বিল থেকে একঝাঁক বুনো হাঁস উড়াল দিল। একটু পরে-পরেই পানকৌটি আর বকের দল। ছড়ানো চাষির দলও উঠে আসছে বিল থেকে। কেউ বোরোধানের বীজতলা তৈরি করছে। কেউ-বা জলের মধ্যে কাদার আল দিচ্ছে, জল নামার সঙ্গে-সঙ্গেই ধান রুইবে।

বকরি দুটোর জন্য ঘাস ছিঁড়তে-ছিঁড়তে একটা জমিতে এসে শায়ের উন্মনা হয়ে যায়। জমিটার চার চৌহদ্দিতে চোখ বুলিয়ে নেয়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় গমের সবুজ ডগাগুলি লহরী তোলে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বুক বেয়ে উঠে আসে। দূর নলডুবরি গাঁ থেকে মাগরেবের আজান-ধ্বনি শুনতে পায়। প্রকৃতি অন্য রূপ ধরে ছায়ালু মায়াবৃত্ত রচনা করে।

একটা ছায়া যেন সেই মুহূর্তে নলডুবরি বিলের দিক থেকে উঠে আসে। সে যে জমিটায় দাঁড়িয়ে, তারই পশ্চিম আলে গিয়ে দাঁড়ায়। লোকটা নামাজ আদায় করেছে। সম্মোহিতের মতো দেখতে পাচ্ছে লোকটা মাটিতে সেজদা দিয়ে অনেকক্ষণ মাথা তুলছে না। তারপর একটা বিড়বিড় স্বর শুনতে পায়, আল্লা, এই আশমান, জমিন সব তুমারই বানানো। কুল মাখলুকাতের সব—সবকিছু, তুমি সবার ভালো করো, খোদা। তুমি ছাড়া কেহু নাই। তুমি তোমার বান্দার তরে মাঠভরা ফসল দাও, রুজি দাও। আমাদের গুনাহখাতা মাফ করে দাও।···'

বড়ো পরিচিত স্বর! শায়ের অভিভূতের মতো চেয়ে থাকে। লোকটা প্রার্থনা-শেষে উঠে দাঁড়াল। জমিটার দিকে কয়েক পলক নির্নিমেষ চেয়ে রইল। তারপর—হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে গেল। শায়ের চিৎকার করে উঠল: বাপজী, বাপজী গো!

সারা গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। এক শীতার্ত অনুভূতি তাকে গ্রাস করতে থাকে। সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মাটিতে শুয়ে পড়ে। সে কি ভুল দেখল? মরা মানুষকে এ ভাবে দেখা যায় নাকি? নাকি তার বাবা—এই জমিটার জন্যই এখানে আসে রোজ? নাকি এই ভারবোলের দিনটাতে মাঠের শস্যভার দেখতে এসেছিল? আদিম চাষি সমাজের এক বিক্ষত উত্তরাধিকারকে তিক দিতে এসেছিল?

মাটি মাকে হেনস্তা করিস না, বাপ। মাটির দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে—মাটিও বিমুখ হয়।

এই সেদিনের কথা মনে হয়। যে জমিটায় সে এখন—সেটা একটা ঝোপঝাড়ে ভরতি ছিল। গাঁয়ের ইয়াসিন মোড়লের জমি। কয়েক শো বিঘে জোত। কে চাষ করবে। লোকজনও তখন খুব কম। শায়েরের বাপ এই কথা দিয়েছিল যে, জমিটা সাফ করার জন্য দু বছরের কোনো ফসল সে দেবে না। তারপর আধা-আধি ভাগ। মাস কয়েক সকাল সন্ধে মাটি কুপিয়ে, আগাছা-মূল উপড়ে ভাওত (জনজাল সাফ করা) করেছিল মানুষটা। কী অমানুষিক ধৈর্য আর নিষ্ঠা ছিল লোকটার। তাকতও কম ছিল না।

শায়ের খাবার মাথায় করে আনত। তাকে দেখেই একছুটে দৌড়ে যেত কাছে, গালে মুখে চুমো দিত। —কাঁটা-খুঁচ বিন্ধে নি তো, বাপ?

দশ বছরের ছেলে শায়ের মাথা দুলিয়ে বলত: উহু! পিয়াস পাইছে, বাপী।

—চল্, চল্, ওই ছ্যাখ নলডুবরির বিল। আয়নার পানা পানি। কত পদ্মফুল ফুটেছে দেখবি—চল্। আমার কাঁধে চাপ। আগে নল ভরে থাকত। তারপর নেল ডোভার সাহেব ইজারা লিল এই মহালের। তখন কী করল জানিস? একটা ডহর কেটে পানি বার করে আমাদের ছোটো নদীতে লিয়ে গিয়ে ফেলল। দেখিস নি, হরিহরপাড়া যেতি গিয়ে পড়ে ডাঁড়াটা।

—উটা মানুষে কেটেছে, বাপ?

—হ্যাঁরে, আমার বাপেরাই তো সি মাটি কেটেছে। যাই বুল, আংরেজ জাতটার 'বিরেন' ছিল। এই বিল থেকেই তো এই নলডুবরি গাঁয়ের নাম। এই বিলই এ-গাঁয়ের মায়ের মতো। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। এই বিল থাকতে কোনোদিন, এই গাঁয়ের মানুষের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না।

জল খেয়ে ফিরে এসে একটা ঝোপের আড়ালে

বসে থাকে শায়ের। বাপ বলে, জড়-মূলগুলান জড়ো কর না বাপ। দুই বাপে-পুতে হাত লাগালে কদিন!

—না। মাটিতে হাত দিব না।

—ছিঃ, ও কথা বলে না! মা খাকি, বড়ো পাক বাপধন। মাটিই তো আমাদের রুজি জোটায় রে···।

—আমি লেখাপড়া শিখব। চাকরি করব।

বাপ খবিরের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। একটা ঢোক গিলে বলে: লেখাপড়া তো সবার জন্যে লয়। কে কী করবে সবই আল্লা আগে লিখে রেখেছে। আমরা হনু গিয়ে মাটির পোকা। কোন্ মাটিতে কী হবে, কী হবে না, চোখে দেখেই বুলে দিব।

—আল্লাকে বুল্লে নাম কেটে দিবে নি?

—দূর পাগল, উভাবে বলে না। আল্লা র‍্যাতরাজ (বেজার) হবে।

সেই ঝোপঝাড়ভরা জংলা জায়গাটা চোখ বুজলে আজো দেখতে পায় শায়ের। কমাসের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর দুবিঘের প্লটটা চোখ তুলে চেয়েছিল। কী ফসল সেই দু বছর! লক্ষ্মী যেন উপছে পড়েছিল। সম্বচ্ছরের খাবার ঘরে রেখে বাপজী তার একজোড়া বলদ কেনে। বড়ো দুই বোনের বিয়ে দেয়। ইয়াসিন মোড়লকে বলে, মোড়লজী, কোন্‌দিন বেচলে আমায়ে দিয়েন গো। গায়ে গতরে রক্ত-ঝইরে পালন করেছি। পোলার চেয়ে দরদ মেখে আছে গো বুকে!

ইয়াসিন মোড়ল বলেছিল, লায়েক জমি কোন্ দুঃখে বেচব, খবির। ডাকলে কথা কয়। তো জবান দিনু যা, জনমভোর ভাগ করে যা। কেউ তোর কাছ থেকে কেড়ে নিবে না।

সেই জমিটা গত সনেই হাতছাড়া হয়ে গেল। হালের বলদজোড়ার একটা ডাকরায় নিল। আর জুড়তে পারল না শায়ের। শেষে ইয়াসিন মোড়লের ছেলে এসে বলল, এবার ছেড়ে দে জমিটা। যার হাল নাই—তার আবার জমির কী দরকার?

—দেখি ভাই, চেষ্টা তদ্বির করে জোড়া লাগাতে যদি পারি।

—তা ছাখ, তবে সত্যি কথা কী জানিস, কপাল ভাঙলে আর জোড়া লাগে না।

ইয়াসিন মোড়লের ছেলের তর সয় নি। তখন দেশ জুড়ে বর্গা রেকর্ডের হিড়িক। কংগ্রেস, সি. পি. এমের দলাদলি। বড়ো চাষিরা ভয়ে তটস্থ। যে যার ভাগের জমি রাতারাতি ফিরিয়ে নিচ্ছে। বেচে দিচ্ছে। সি. পি. এমের কয়েকঘর ভোটুরে চাষি এসে শায়েরের কানে-কানে বলল: এট্টা পিটিশান করে দে, শায়ের। পেধ্‌ধান দলের। ভাগজোত হয়ে যাবে।

শায়েরের মন সায় দেয় না। সে ভাবে—লাঙল-হীন তার মতো চাষির জমি দখল করে রাখা ঠিক হবে না। তা ছাড়া, ইয়াসিন মোড়লের লেঠেল বাহিনীর সাথে সে এঁটেও উঠতে পারবে না। মন ঠিক করে জানান দিতে যাবার আগেই সে খবর পেল—মোড়লের হাল বইছে জমিতে। শায়ের আর কোনো-দিন ওজমিমুখো হয় নি।

কতক্ষণ সম্মোহিতের মতো পড়ে থাকার পর শায়েরের খেয়াল হয়। রাত গাঢ় হয়েছে। চোখ চেয়ে আশুর ধারা বয়ে বুক ভিজিয়েছে। হালকা কাদা চাদরে। মনে-মনে বলে: বাপজী, ঘাট নিও না।

হঠাৎ দূরে মিলিত গুঞ্জনে সে উৎকর্ণ হয়। দেখতে পায় মাঠ আলো করে পাটকাঠি জ্বালিয়ে কারা তার দিকেই এগিয়ে আসে। ছাখে, তার দলের ভার-বোলারা। তাকে দেখেই সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে: উস্তাদজী! আপনি এখানে।

ভূমি থেকে উৎখাত একদঙ্গল চাষিঘরের ছেলে লক্ষ্মীমাসকে বিদায় জানিয়ে মাঠে চড়ুইভাতি করে ফিরে আসছে। তারা কিছুই জানে না, বুঝতে পারে না, তাদের ওস্তাদের ব্যথার উৎস কোথায়?

—তোমাদের পালা শেষ হল?

—হ্যাঁ, উস্তাদ। আজকের রান্না খুব জুতসই হয়েছে। আপনাদের জন্যও খাবার বেঁধে এনেছি।

—পাগল সব। স্নিগ্ধ হাসি হঠাৎ তার মুখে খেলা করে যায়।

—সামনের বছর কিন্তু ফাটানো বোল বানাতে হবে, ওস্তাদ।

শায়ের কোনো জবাব দেয় না। ওদের আগে-আগে হাঁটতে থাকে। শীতের হাওয়া তীক্ষ্ণ ফলার মতো লোমকূপ বেয়ে সেঁধিয়ে যায় শরীরে। ত্যানা-জড়ানো ছায়ামূর্তিগুলো যেন কোনো আদিম প্রান্তর দিয়ে এগিয়ে যায়। কী এক বিষণ্ণতা, বধিরতা এই-মাত্র ওদের মর্ম বিদ্ধ করেছে। প্রবল এক গোষ্ঠীপতির তাড়া খেয়ে ছিন্নমূল একটা কৌম যেন রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে পালাচ্ছে। যারা লাগাতরে নতুন চাষ-যোগ্য জমি তৈরি করেছিল, ফসল ফলিয়েছিল—তারা আজ পরাজিত। আবার অন্য কোনো প্রান্তে একখণ্ড সবুজ দ্বীপ তারা সৃষ্টি করবে। গোষ্ঠীপতির দুবেলা চাবুক আর শাসানির চেয়ে স্বাধীন জীবনের স্বপ্ন দেখাই পৌরুষের।

শায়ের যেন সেই বঞ্চিত কৌমের পলাতক দলপতি। আজকের দিনেও সেই ইতিহাসের ধারা অন্যভাবে, অন্যরূপে তাদের উৎখাত করেছে। দুটো হাত ছাড়া কিছুই সম্বল নেই। সেই পূর্বপুরুষের তাড়িত ক্ষুধা আর স্থায়িত্বের অনিশ্চয়তা তাদের এখনো ছুটিয়ে নিয়ে ফিরছে।

মাঠ শেষ হয়ে গাঁয়ের সীমায় ঢোকার আগেই শায়ের গেয়ে ওঠে:

মা খাকী গো তোমার বুকের শুক্ত যারা খায়
নিঠুর তারা তোমার প্রতি দয়া তাদের নাই॥
যারা মাটির পোকা
তারা যে আজ বোকা
সকাল সন্ধে খাটনি করেও পেট পুরে না তায়॥

নাঙ্গল বলদ উঠে গিয়ে ট্রাকটরে হয় চাষ
জমির মালিক তুই চিনে না, চিনে না কোনো ঘাস।
বখিল (কৃপণ) তারা বখিল,
কাক সেজেছে কোকিল
ঘাট নিও না অধম পুতের—এ ভিক্ষা আজ চায়॥

*

সেই রবিফসল না পাকলে আর কাজ নাই। বাঘড়ির দিনমজুরের ঘরে-ঘরে হাহাকার। দেশে সরকার আছে। পঞ্চায়েত আছে। মাইক ফুঁকে বলে মানুষ সুখে আছে। সরকার ফুড ফর ওয়ার্কে দিনমজুর, অভাবী চাষিদের কাজ করাচ্ছে।

শায়ের শুনতে পায় কোথায় কোন্ রাস্তায় কাজ চলছে। কোদাল পেছে নিয়ে যায়, মেম্বার বলে আগে থেকে স্লিপ বিলি হয়ে গেছে। অন্য রাস্তার কাজ হলে জানাব।

জীর্ণ খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে ছিল শায়ের। জানেরা মুখ ঝামটা ছায়: ইভাবে বসে থাকলে চলবে? সংসারে ত মনিষ্যি বলতে ন্যাওটা বউটা। তাকেই দুবেলা আহার দিতে পার না। পোলাপানা থাকলে তো কী কত্তে ভাবাই যায় না।

—কী করব বলো। মাটিকাটার কাজ কদিন চলে তার ঠিক নাই। তার আবার সিলিপ ফিলিপ কারবার। বুঝলে এ রহস্য। জান, সত্যি আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না! আফশোস শায়েরের কণ্ঠে।

—বসে-বসে গান বাঁধবার বেলায় মাথায় বুদ্ধি আসে। এখন সেই বুদ্ধিটাকে খাটাতে পার না! নামেই পুরুষ। তোমার সাঙাতরা সব কাজ পায়, তুমি পাও না! জানেরার কণ্ঠে উষ্মা ঝরে পড়ে।

—ওরা তো কিছুই বলে না।

—বলবে কেনে, ঘরে-ঘরে আগুন জ্বলছে। খোঁজ কে রাখবে? কাল গাঁয়ের নিম্বার এসেছিল। বলছিল, পার্টির চাষি সমিতির নিম্বার হতে। কত দিয়ে একটা রসিদ কাটলেই হয়। এও কি আমাকে খোঁজ নিতে হবে। বলেই হু-হু কান্নায় ভেঙে পড়ে জানেরা।

—আমাকে সমিতির সভ্য হতে হবে? না হলে কাজ মিলবে না?

—ক্যানে, তোমার ট্যামক কিসের অত? ঘরের চালে খড় নাই। ঘরে খাবার নাই। এসব কে ভাববে? আমি? না, পারব না। কাঁথা সেলাই করে, পাটি

বুনে উপায় করতাম—দুমাস থেকে তাও বন্ধ। দেখছ, সুঁচ বিঁধে 'সেপটি' হয়েছে?…

—জানেরা, আমি যাব। কত চাঁদা লাগবে—

—জানি না। জানেরা ঘরে ঢুকে যায়। পাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকে।

শায়ের এত কাছের মানুষটিকে বুঝতে পারে না। অভাবে জীবনটা তার সব সৌকুমার্যই হারায়। আর এই সংসারটাও—তার সব নিষ্ঠুরতার রূপগুলি নিয়ে হাজির হয় দোরগোড়ায়। সেখানে ভালোবাসা, স্নেহ-প্রীতি সবকিছুই গৌণ হয়ে দাঁড়ায়।

নিজেকে একটা ক্লীব মনে হয়। সে এই পৃথিবীর অযোগ্য। সে ভাবে, এই পৃথিবী, মাঠ-মাটি-মানুষের যে সমীকরণ করেছিল—কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। সেই ফাঁক এত অল্পে সে ভরাট করবে কী করে? অথচ জানেরা যদি বুঝত! ঘরের মানুষটিই যদি দূরে সরে থাকে তাহলে সে বুক বাঁধবে কীভাবে?

এই নিদারুণ মুহূর্তেও যেন কোথায় একটা পাখি গেয়ে উঠল। নাকি বিকৃত সুরটা সে অন্যভাবে শুনল? এত সরল, পলিমাটি দিয়ে গড়া কেন তার হৃদয়! কান থেকে আধ-খাওয়া বিড়িটাকে ধরায়। একটা কটু গন্ধ তার জিভটাকে তিতকুটো করে তোলে।

এমনি পাখি সেদিন ডাকত। বইত অন্যরকম হাওয়া। তখন সে আলকাপের ছোকরা থেকে সবে ছড়াদার হিসেবে নানা আসরে নাম পাচ্ছে। সারাদিন খাটুনির পর রাতে মজিদ ফকিরের দলে গান করত। রাতে ফেরার পথে রমনার শেষ সীমানায় বেড়ার ধারে দেখত—কে আসর ভাঙার আগেই চলে এসে তার প্রতীক্ষা করছে।

—ছড়াদার—ছড়াদার গো…ফিসফিস স্বর।

—কে?

—আসরের জোড়া চোখ মনে পড়ে না?

—জান?

—হুঁ। কাল কোথায় আসর গো?

—মেলায়। রামকেষ্টপুরে প্যানডেল করে গান। যাবি?

—কখন?

—সারা দিন রাত। ওয়াশেফ আলি আর মজিদ ফকিরের দলের পাল্লা। ঘুটের মালা আর টাকার মালা আজ থেকেই টাঙিয়ে দিয়েছে। উত্তেজনায় কাঁপে শায়ের।

—তুমি জিতবে তো?

—তুই থাকলে সব পারি। যাবি?

—দেখি, সইকে বুঝিয়ে রাজি করায়।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে কখন শায়ের ঘনিষ্ঠ হয়ে একটা চুম্বন এঁকে দেয় জানেরার গালে।

হাজার-হাজার মানুষের মেলার মাঝখানে বোল-তলায় কালীমন্দিরের সামনে প্যানডেল। চারদিকে টাপ্পড় ভিড়। ওস্তাদ মজিদ ফকির আর ওস্তাদ ওয়াশেফ আলির দলবল মুখোমুখি বসে। মজিদ ফকির তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে: ভয় করিস নে, বাপ। আজ শুধু দলের জয়-পরাজয়ের ব্যাপারটাই বড়ো নয়। এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারটাও জড়িয়ে আছে। এই কথা ভুলিস না। আমার দল জিতলে টাকার মালা তোর গলাতেই পরিয়ে দিব।

প্রথম বড়ো আসরে হাজার-হাজার মানুষ দেখে সে ঘাবড়ে গিয়েছিল। একবার ওস্তাদ মজিদ, আরেক-বার ওস্তাদ ওয়াশেফ এইভাবে পালা চলছিল। এক সময় ছড়ার আসর শুরু হতেই ওস্তাদ মজিদ বলল: আজ আমার বদলে এক নওজোয়ান ছোকরা ছড়া শোনাবে। শায়ের উঠে দাঁড়াতেই চারদিকে হুল্লোড় শুরু হয়ে গেল। তার গত বানের ওপর রচিত ছড়াটা শোনাবে সে। কিন্তু সে কেমন অসহায় বোধ করে। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে একটি মুখ তার দিকে চেয়ে খুশিতে চলকে ওঠে। সে কেমন উদ্দীপনায় জেগে ওঠে:

সন তেরোশ পঞ্চাশ সালে
দেশে আইল বান গো…
সিক্রার বাঁধ ভেঙে ও ভাই

ডুবল পাকা ধান গো।
সন তেরশো……

চারদিক স্তব্ধ। পিন পড়ার শব্দ শোনা যায়। আধঘণ্টা সময় কীভাবে পার হয়ে যায়। তার পালা শেষ হতেই চারদিকে আনন্দ-উচ্ছ্বাস। টাকার ফেরি বৃষ্টির মতো পড়তে থাকে। ওস্তাদ মজিদ তাকে বুকে জড়িয়ে চুমো খায়। চারদিকে ওস্তাদ মজিদের জয়-জয়কার। ওস্তাদ ওয়াশেফও তাকে বাহবা দেয়। টাকার মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে মজিদ বলে: বাপ শায়ের, এ জয় তোর। আমার পরে তোকে আমার শিষ্য করে যাব। তুই পারবি।

তখন রাত হয়ে গিয়েছিল। আসর থেকে বেরিয়ে সে জানেরাকে খুঁজে হয়রান। দেখে কালীমন্দিরের থামে ভিড়ে মুখ লুকিয়ে কাঁদছে। সে গিয়ে কাঁধে হাত ছোঁয়াতেই জান বুকে মুখ রেখে কাঁদে—আমার কথা মনে ছিল না এতক্ষণ?

—ছিল জান, কতক্ষণ হল তোকে খুঁজছি। চল, তুই যা চাইবি—তাই কিনে দিব। ওস্তাদ খুশি হয়ে টাকার তোড়াটা আমাকে বখশিশ দিয়েছে!

কেমন ছবির মতো দিনগুলো ফুরিয়ে গেল। তখনো তার বাপ বেঁচে। ছেলের গানের লাইন তাকে টানত না। বলত: উ-উচ্ছন্নে জীবন, বাপ। গানের লাইন ছাড়। ঘর-সংসার কর। মাটির গান বাঁধ। সেই বছরই জানের সঙ্গে বিয়ে হল।

কী সুন্দরভাবেই না শুরু হয়েছিল জীবনটার। কিন্তু একটা দুঃখ—তাদের দুজনের মনে গোপনেই ছিল। কোল-আলা-করা একটি শিশুর অভাব। এ মন-বেদনা আর ঘুচল না! জানেরা তাকে বুঝতেই দিত না। কিন্তু শায়ের চেষ্টাও তো কম করে নি!

দিন-দিন কেমন যেন আশ্চর্য বদল শুরু হল জানেরার। সারাদিন পরিশ্রম করে ঘরে ফিরে মনে হয় সে ঠিক আগের মতো সেবা পাচ্ছে না। ফুড়ুত ফুড়ুই চড়ুইয়ের মতো জানেরার মনটা তার নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। অভাব আগেও ছিল, তার চেয়ে অভাববোধটা যেন অন্যভাবে জানেরাকে পেয়ে বসেছে। আগে দুজনে বসে কত গল্প করত। সংসার, সমাজ, পাড়াপড়শিদের দু-চার কিসিম ভাবনার সময় পেত। এখন যেন কিছুতেই মন নেই।

—শোনো, পেধধান এসেছিল—, তুমি তাদের দলের হয়ে ছড়া বানাও। ওরা তোমাকে এখান-সেখান নিয়ে যাবে। তোমাকে ওরা গরমেনট থেকে টাকা পাইয়ে দিবে। আমাদের ঘরটার একটা বিহিত হবে।

—তুমি কী বলছ। ওদের কী কাজ, কী ভাব—তারই তো বুঝি না।

—যা বলবে তাই বানায়ে দিবে। তোমার কত সম্মান হবে। এতেও তোমার না? রাগে ফেটে পড়ে জানেরা।

—তুমি ঠিক বুঝতে পারছ না, জান।

—তুমি সব বোঝ, আমি কিছু বুঝি না—না? তোমার এত আত্মসম্মান? ভারবোল বাঁধতে তোমার আঁতে ঘা লাগে না? তুমি যতসব ভিক্ষার ছড়া বানাতে পার, ঘরে-ঘরে তাই বোল কেটে ভিক্ষে কর। এতে বাধে না?

—জানেরা, তুমিও ভুল বুঝলে? ঘরে-ঘরে বোল কেটে ভার আদায়ে লজ্জা নাই। সব চাষিকে লক্ষ্মী-মাসকে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যই বাপ-পিতামো এই পার্বণ চালু করেছিল।

—অত সব আমাকে বুঝায়ো না। বলো, তুমি গান বাঁধবে? না হলে আমার মরা মুখ দেখবে…।

—জান—!

হ্যাঁ। পেধধান বলে গেছে, সরকার গরিব মানুষের জন্য ভাবছে। লড়াই করছে। সেই কথাই গানে বাঁধবে। সুর দিবে। কমাস পর শীতে বড়ো ফাংশন হবে। তোমাকে গাইতে হবে। মন্ত্রী আসবে।

—ঠিক আছে।

ধীরে-ধীরে এসে গেল লক্ষ্মীমাস পৌষ। ভার-বোলের আগের দিন ফাংশন। সংস্কৃতি বিভাগের

বড়ো-বড়ো পোস্টার ফেস্টুন চারদিকে টাঙানো। "লোকসংস্কৃতিকে বাঁচাও"। "দুঃস্থ লোকশিল্পীদের পাশে দাঁড়ান"। "জেলার লোকসংস্কৃতি-সম্মিলনে দলে-দলে যোগ দিন"। চোখধাঁধানো বিশাল মঞ্চ। ময়দানে হাজার-হাজার মানুষ। বাউল, আলকাপ, বোলান—আরো নানান রকমের আয়োজন। মঞ্চের মাঝখানে একটা সুসজ্জিত টেবিলের সামনে মন্ত্রী মহোদয় বসে। গলায় বিরাট ফুলের মালা। পাশের মঞ্চে একেক শিল্পী গান গেয়ে যাচ্ছে। মাইকে নাম-ঘোষণা চলছে। এক সময় শায়েরের নাম ঘোষণা হল: এবার বিখ্যাত ছড়া ও পাঁচালিকার শায়ের আলি তার ছড়া শোনাচ্ছে:

শায়ের মঞ্চে উঠে হাত জোড় করে বলল: আগেই আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি মুখ্যু মানুষ। বিদ্যে বুদ্ধি নাই। মুখে মুখে বানানো আমার ছড়াটা বলছি। আমি যেভাবে আমার সমাজ, মানুষের অবস্থা, হাল হকিকত দেখেছি তারই বর্ণনা—

শুনেন সবে বন্ধুগণে শুনেন দিয়া মন,
আশ্চর্য আন্ধারে আজ দেশের নিমজ্জন।
রক্ষক যে ভাই ভক্ষক সে এই তো দেখি চলে
বদলে জামা শিয়ালমামা কুমিরছানা পালে।
যুগে যুগে একই খেলা গরিব দুখা জনে
অর্ধাহারে অনাহারে মরছে কাম বিহনে।

চারদিকে একটা কলহ শুরু হয়ে যায়। কে এসে মাইক্রোফোন কেড়ে নেয়। আর কয়েকজন গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে নিয়ে আসে স্টেজ থেকে। শায়ের কিছুই বুঝতে পারে না। চিৎকার করে বলে: আমি কী অন্যায় করেছি! আমার কত সাধের ছড়া, আমাকে বলতে দ্যান—বলতে দ্যান···

অন্ধকার। ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। লজ্জায়-ঘৃণায় মাখা-মাখি হয়ে টলতে-টলতে অনেক রাতে ঘরে ফেরে। ডাক দ্যায়, জান—জানেরা। ভিতর থেকে চেগারের পাল্লা বন্ধ। টিমটিমে আলোয় উবু হয়ে বাতার ফাঁক দিয়ে ঘর শূন্য মনে হয়। কিসের একটা গন্ধ নাকে আসে। সে জোর করে ধাক্কা মারতেই চেগারটা সরে যায় ক্যাঁচ করে। সে চিৎকার করে ওঠে। দ্যাখে, একটা নিষ্প্রাণ দেহলতা ঝুলছে ঘরের চালে।

জানেরার ঝুলন্ত পায়ে মুখ রেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠে: এমনি ভাবে শোধ নিলে, জান। তুমি আমাকে ভুল বুঝলে! আমি কি কোনো অন্যায় করেছি? কী অন্যায় করেছি, জান? একটা নতুন ঘর, কিছু দিনের খাবার আর সম্মান হারিয়েছি—এই তো? কিন্তু আমি যে সত্যসাধক। মাটির মানুষের কথাই যে আমার ভাষা। বাপ-পিতামোর কথা ভুলি কী করে? কী করে সেই সবহারা কৌমের বুকভরা ব্যথার কাহিনীকে রঙ লাগিয়ে গাই? তুমি এ কী করলে, জানেরা! পেধ্‌ধান তোমাকে চরিত্র দেয় নি। শুধু লোভ দেখিয়েছে। তুমি তাতেই ভুলে গেলে?·····

ময়না তদন্ত হয়ে পরদিন ফিরে এসে দুপুরের পরে জানেরার মরদেহের দাফন সারা হল। এ গাঁয়ে আলাদা কোনো গোরস্থান নেই। শায়েরেরও ভিটি ছাড়া আলাদা জমি ছিল না। তাই শায়েরের ইচ্ছেমতো বাড়ির উঠোনের এক পাশেই তাকে কবর দেওয়া হল।

আজও সেই শেষ পৌষ। ভারবোলের দিন। এই দিনের জন্য একটা বোল রচনা করে রেখেছিল সে। কয়েকজন শিষ্যের কণ্ঠে সেই কথা আর সুর কদিন আগেই সে তুলে দিয়েছিল। সে আগেই ঠিক করে রেখেছিল, আর কোনো ভারবোল সে বানাবে না। ঘরে বাইরে এই বোল—এই ভার-চাওয়াকে নিয়ে বেজুত কথা।

মনে পড়ে না, আজ ছেলেরা ভারবোলে বেরিয়েছিল কিনা। তার ভাবতেও ইচ্ছে করে নি। ধীরে-ধীরে অন্ধকার ঘনাতেই চির-উচ্ছল বাড়িখানা কেমন ভার হয়ে ওঠে। ঘর থেকে একটা পিদিম এনে জ্বালিয়ে দেয় কবরের শিয়রে। তারপর ঝুঁকে পড়ে চুমো খায় মাটিতে। বুকে ঠেকায়। বিড়বিড় করে বলে: ক্ষমা করো বাপ-পিতা-মো, ক্ষমা করো জান,

গাঁওয়াল ভাই, আমার মাটি···

অশ্রুসজল চোখ দুটি ঘরের শূন্য চালার দিকে বুলিয়ে নিয়ে, গায়ে ছেঁড়া কম্বলটা জড়িয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়ে। সে জানে না, কোথায় যাবে। গাঁয়ের শেষ প্রান্তে এসে সে শুনতে পায় তার শেষ বোলটি কোথায় সুর হয়ে উঠছে:

বল ভারবোল ভারবোল ভারবোলারে ভাই
বড়োই আন্ধা ঘনিয়ে আসে তামাম বাঙলায়।

মাঠ-মাটি মানুষের জীবনের বোলকার দ্রুত মাটির সীমানা ছাড়তে চাইছে। সে তার পরাহত কৌমের শেষ নিশানটি নিয়ে একাই পথ হাঁটে। অন্ধকার পিছু-পিছু জমাট বেঁধে থাকে। সামনেও সেই অন্ধকার। তবু তাকে হাঁটতেই হবে। অশেষ অনন্ত পথযাত্রা তার। তার সামনে কোনো মানচিত্র নেই।

ধারাবাহিক রচনা "অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা"র এপ্রিল ১৯৯১ কিস্তিতে প্রবন্ধকার কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদের উল্লেখ করেছেন।

পৃষ্ঠা	কলম / লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৪৭	২/২	আসুরিস	আসুবিস
৯৫০	২/২	বড়বানল	বাড়বানল
৯৫৪	১/২৭	প্ল্যাটা	প্ল্যাটো
	২/১৭	সিরিস	ওসিরিস
	২/২৩	লাকাম	লাকমে
৯৫৭	২/২১	খ্রীষ্ট	খ্রীষ্ট, হজরত রসুল
৯৫৮	২/৪	ইন্দ্র	ইন্দ্র পুরন্দর বা পুরধ্বংসকারী
৯৬২	২/২৯	Domboy	Domboq
৯৬৩	২/শেষ লাইন	জুইশ	প্রাক্‌জুইশ
৯৬৬	২/২৫	আচমনপ্রথা	আচমনপ্রথা ও গ্রেস

রবীন্দ্র-নজরুল একটি সাক্ষাৎকার

গোপালচন্দ্র রায়

রবীন্দ্রনাথ কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা আর গানের যেমন প্রশংসা করতেন, তেমনি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহও করতেন। এ সম্পর্কে নজরুলের নিজের কথাতেই বলি, 'কতদিন দেখা হয়েছে, আলাপ হয়েছে, নিজের লেখা দু-চারটে কবিতা-গানও শুনিয়েছি—অবশ্য কবির অনুরোধেই।···অনেক দিন তাঁর কাছে না গেলে নিজে ডেকে পাঠিয়েছেন। কতদিন তাঁর তপোবনে গিয়ে থাকবার কথা বলেছেন, হতভাগা আমি, তাঁর পায়ের তলায় বসে মন্ত্র গ্রহণের অবসর করে উঠতে পারলাম না।'

কলকাতায় জোড়াসাঁকোয়, শান্তিনিকেতনে এবং অন্যত্রও বিভিন্ন সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দেখা হয়েছে অন্তত সাত-আট বার। প্রথম সাক্ষাৎ হয় শান্তিনিকেতনে ১৯২১-এর অকটোবরে। সেবার নজরুলের সঙ্গী ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। এই প্রথম সাক্ষাতের দশ বছর পরে দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের যে সাক্ষাৎ হয়, সেটা ছিল সম্ভবত তাঁদের সপ্তম সাক্ষাৎ। এই সাক্ষাৎ নিয়েই এখন কিছু বলছি—

"শনিবারের চিঠি"র সম্পাদক সজনীকান্ত তাঁর "আত্মস্মৃতি" গ্রন্থে লিখেছেন—

'দার্জিলিং গিরিশৃঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত কবি নজরুল ইসলামের মুলাকাত হয়। এই সাক্ষাৎকার-প্রসঙ্গ হাবিলদার-কবি স্বয়ং প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে এই নৈর্ব্যক্তিক আলোচনাটি ছিল—"কবি হেসে বললেন, সজনে গাছকে কোনো রকমেই উপেক্ষা করা চলে না, কেননা চমৎকার ফুলঝুরির মতো ফুল সেজে থাকে।" ···কবি হাসতে হাসতে বললেন, "এইরকম আর-একটি জীবের নাম করা চলে, দেখতে সে বেশ সুশ্রী, কিন্তু সেও ঠিক এই কারণে সাহিত্যের আসরে একঘরে হয়ে আছে। আমরা সবাই উৎসুক হয়ে উঠলুম। তিনি মুখ টিপে বললেন, মুরগী।'

'···রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপর আরও চটিলেন। তাহার প্রকাশ হইল কার্তিকের "বিচিত্রা"য় 'নবীন কবি' প্রবন্ধ। শনিবারের চিঠির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া 'সাহিত্যিক মোরগের লড়াই' কথাটা তিনি ব্যবহার করিলেন।···

'পূর্বের "সজনেফুল" ও "মুরগী"র ঘা মনে ছিল, নূতন করিয়া সাহিত্যিক মোরগের উপমা তাহাতেই জ্বালা ধরাইয়া দিল। ইহারই লজ্জাকর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইল ১১ই পৌষে (২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩১) অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জয়ন্তীকে কেন্দ্র করিয়া।···আমরা "জয়ন্তী-সংখ্যা" প্রকাশ করিয়া ব্যজস্তুতিচ্ছলে কঠোর রবীন্দ্র-বিদূষণ করিয়া বসিলাম। শ্রীঅমল হোম প্রমুখ রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উদ্যোক্তারা লক্ষ্য হইলেও সরাসরি রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত কম করিলাম না। ···মোটের উপর আমাদের প্রতিহিংসা-পরবশতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গেল।'

"শনিবারের চিঠি"র মলাটে থাকত মোরগের ছবি। আর "সজনে" শব্দের সঙ্গে সজনীকান্তের নামেরও অনেকটা আক্ষরিক মিল থাকায় সজনীকান্ত ভেবেছিলেন, কবি তাঁকেই লক্ষ্য করে ওই কথাগুলো বলেছিলেন। সত্যই কবি সজনীকান্তকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন কিনা তা বলা যায় না। কেউ কেউ বলেন, সজনীকান্ত বা তাঁর "শনিবারের চিঠি"র দল কবিকে যেভাবে আক্রমণ করতেন, তাতে করে কবির পক্ষে ওই কথা বলা হয়তো একেবারে অসম্ভবও ছিল না।

কার্তিকের "বিচিত্রা"য় 'নবীন কবি' প্রবন্ধটা দেখেছি। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত তরুণ কবি বুদ্ধদেব বসুর কয়েকটি কবিতা পড়ে, সেই কবিতাগুলির প্রশংসা করেছিলেন, ওই প্রবন্ধে তিনি প্রসঙ্গত লিখেছিলেন—'নিঃসহায় মোরগা ও মেড়ার লাঞ্ছনায় যে আনন্দোচ্ছ্বাস নিঃশেষিত হলে অপেক্ষাকৃত লঘুতর অপরাধ হত, আমাদের সেই দুয়ো দেবার দুর্দাম নেশাকে আমরা সকল উপলক্ষেই ভোঁতা করবার চেষ্টা করি বলে বাংলাদেশে কোনো বড়ো কাজই ভদ্রভাবে বেড়ে উঠবার সুযোগ পেল না। নিজের দেশের মানুষকে এবং কাজকে নিজের হাতে খর্ব করবার শখ আমাদের কিছুতেই মিটতে চায় না। সেই শখ বিছুটির মতো গজিয়ে ওঠে, আমাদের রাষ্ট্রসভায়, ধর্মসম্প্রদায়ে, সাময়িক পত্রে, জনসেবাকর্মে, ছাত্রদের হস্‌টেলে। আমাদের সাহিত্যবিচারে মনন বস্তুর দৈন্য যথেষ্ট, সেই অভাবকে ঢেকে দিই দুয়ো দেবার উত্তেজক মসলায়। যাকে আমরা ভালো বলতে চাই, তাকে ভালো বলেই আনন্দ পাইনে, তাকে পক্ষভুক্ত করে নেই এবং আর-একজনকে প্রতিপক্ষ খাড়া করে তবে আমাদের শখ মেটে। একজন গুণীর পরিচয়কে উজ্জ্বল করবার উপলক্ষে আর-একজনের প্রতিপত্তিকে ধূলিশায়ী করবার যে উৎসাহ, সে সাহিত্য নয়, সে সাহিত্যিক মোরগের লড়াই। এই লড়াইয়ে কোনো দিন আমি যোগ দিই নি, যদিও খোঁচা অনেক খেয়েছি।'

সজনীকান্তর "আত্মস্মৃতি" পড়ে জানা যায়, দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের যে সাক্ষাৎ হয়েছিল, নজরুল স্বয়ং সেই সাক্ষাতের কথা ১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা "স্বদেশ" মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেছিলেন।

এই আশ্বিন সংখ্যা "স্বদেশ" পত্রিকা কোথাও পাই নি, তাই কারও-কারও লেখায় ওই রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাৎকারের কথা কিছু-কিছু পেলেও, সমস্তটা পেলাম না। এই যে কারও-কারও লেখার কথা বললাম, এঁদের কয়েকজনের লেখা এখানে উদ্ধৃত করছি।

১৩৬০ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ যুগ্ম সংখ্যা "শিক্ষাব্রতী" পত্রিকায় অখিল নিয়োগী তাঁর "রবীন্দ্র-স্মৃতিকথা" প্রবন্ধে লিখেছেন—

কবিকে আরো অন্তরঙ্গভাবে একবার পেয়েছিলাম দার্জিলিং-এ। পুজোর ছুটিতে দার্জিলিং বেড়াতে গেছি। সেখানে গিয়ে কবি নজরুল ইসলাম আর নাট্যকার মন্মথ রায়ের সঙ্গে দেখা।

হালকা হাওয়ার পাখা মেলে দিনগুলি উড়ে

গোপালচন্দ্র রায়ের জন্ম ১৯১৬-র ১২ই এপ্রিল। তিনি সাহিত্যিক এবং সমাজকর্মী। এ পর্যন্ত চল্লিশটিরও অধিক বই তিনি লিখেছেন। এর মধ্যে শরৎচন্দ্র (৩ খণ্ড), বঙ্কিমচন্দ্র (২ খণ্ড), ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্রাবলী, জীবনানন্দ ইত্যাদি বইগুলি বিখ্যাত। বর্তমানে ইনি পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্থাপিত ঋষি বঙ্কিম গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালার অধ্যক্ষ হিসাবে একটানা ৩৬ বছর যাবৎ কর্মরত।

যাচ্ছিল। কবি নজরুল তখন অজস্র কবিতা রচনা করছেন আর প্রতি সন্ধ্যায় নতুন-নতুন গান লিখে সুর করে শোনাচ্ছেন! ভাবলে ভারী আনন্দ লাগে। কী মজার দিনই তখন গেছে।

প্রতি সকালে আর সন্ধ্যায় নজরুলের ওখানে আমাদের আসর বসে। তারপর এখানে-ওখানে-সেখানে খুব করে দল বেঁধে বেড়ানো।

এরই মধ্যে খবর পাওয়া গেল—রবীন্দ্রনাথ রয়েছেন দার্জিলিং-এ—আমাদের খুবই কাছে।

নজরুল প্রস্তাব করলেন, একদিন দলবেঁধে কবির কাছে যাওয়া যাক।

যে কথা সেই কাজ।

নজরুলের কিছুতেই তর সয় না। সেই সময় দার্জিলিং-এ আলতাফ সাহেব আর তাঁর বোন জাহানারা বেগমও রয়েছেন। ইনিই পরে "বর্ষবাণী" নামে বার্ষিকী প্রকাশ করেছিলেন। দলটি নেহাত মন্দ হল না।

'দীন যথা যায় দূরে রাজেন্দ্রসঙ্গমে'—আমরা রওনা হলাম কবি-সকাশে!

পথে কত গল্প, কত গানের কলি···

কালের স্রোতে সেগুলি কোথায় হারিয়ে গেছে!

কবিভবনের দ্বারদেশে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হল। তাঁর সঙ্গে বোধহয় নজরুলের আলাপ ছিল। তিনি সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে কবিকে ভেতরে খবর দিতে চলে গেলেন।

নজরুলের নাম শুনে কবি তাড়াতাড়ি আমাদের দর্শন দিলেন।

প্রথমেই কাজি নজরুল কবির কাছে উপস্থিত সবাইকার পরিচয় দিলেন। আমরা পায়ের ধুলো নিয়ে তাঁকে ঘিরে বসলাম সবাই।

কবি সেই বছর সত্তর বছরে পদার্পণ করেছেন। আমি আবার তাঁকে উপহার দেবার জন্যে আমার একখানি নতুন লেখা বই হাতে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। বইখানি উৎসর্গও করা হয়েছিল কবির নামে।

প্রতি পৃষ্ঠাতেই আমার আঁকা ছবি ছিল। তখন আর্ট স্কুল থেকে বেরিয়েছি, তাই ছবি দিয়েছিলাম প্রচুর। কবি অনেকক্ষণ ধরে উলটে-পালটে বইখানি দেখলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'আচ্ছা, পড়ে দেখব।'

এর পর শুরু হল আলাপ-আলোচনা। নজরুলকে নিজের পাশে পেয়ে কবি আজ ভারী খুশি।

কথার ওপর কথা চলল—বাঙলা সাহিত্যের গল্পের কথা, নাটকের কথা, গানের কথা, বিদেশী কবিদের কথা। আমরা শুধু মুগ্ধ হয়ে শুনে যাচ্ছি।

ভাগ্যিস নজরুল সঙ্গে ছিলেন—তাই তো কবিকে এত ঘরোয়াভাবে পাওয়া গেল।

আমাদের বরাত ভালো বলতেই হবে।

নজরুল সেই সময় মন্মথ রায়ের কয়েকটি নাটকে গান রচনা করে দিয়েছিলেন। সেই নাটকগুলি কেমন জমেছিল কবি জিজ্ঞাসুনেত্রে সে প্রশ্ন করলেন এবং নানারকম গানের সুর নিয়ে বেশ কিছুটা রসিকতা করতেও ছাড়লেন না।

বিদেশী কবি দানেনৎশিও সম্পর্কেও খানিকক্ষণ আলোচনা চলল।

এদিকে বেলা বেশ বেড়ে গিয়েছিল। রথীন্দ্রনাথ কয়েকবার জানলা দিয়ে উঁকি মেরে গেলেন। কবির মধ্যাহ্ন আহারে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।

কুঠার সঙ্গে সে কথা জানানোও হল। তাই তো। কারো খেয়াল হয় নি যে আনন্দে, আলাপে-মজলিশে কবিকে দীর্ঘকাল শুধু আটকেই রাখা হয় নি, তাঁকে অভুক্তও রাখা হয়েছে!

কবি কিন্তু সে ব্যাপারে একেবারে নির্বিকার! কথা বলবার মনের মতো মানুষ পেয়েছেন, তাই আজ তাঁর নাওয়া-খাওয়ারও জ্ঞান নেই!

নজরুলকে তিনি কতখানি স্নেহ করেন, সেকথা সেদিন মর্মে-মর্মে বুঝতে পেরেছিলাম সবাই।

তখনকার দিনে জীবিত কবিদের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই নিজের রচিত কাব্য উৎসর্গ করে কবি নজরুলকে যে সম্মান দিয়েছিলেন—তা অসামান্য।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ভুঁইয়া ইকবাল তাঁর "রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ পত্র" পুস্তকে নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন—

নজরুল-জীবনীকার আবদুল কাদির উল্লেখ করেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ একদিন আলাপ-প্রসঙ্গে নজরুলকে তুলনা করেন ইতালীয় কবি দান্নুসজিওর সঙ্গে। নজরুল ১৩৩৭ সালের আষাঢ় মাসে শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীঅবনী রায়, শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীপ্রবোধ গুহ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে গেলে, রবীন্দ্রনাথ স্নেহের সুরে তাঁকে বলেন, 'ইতালীতে এক দ্বীপের মাঝখানে বাস করেন দান্নুসজিও, তিনি তোমার চাইতেও পাগল।'

আবদুল কাদির এই লেখাটা উদ্ধৃত করেছেন রফিকুল ইসলামের "নজরুলজীবনী"র ৫৩৩-৩৪ পৃষ্ঠা থেকে।

১৩৯৪ সালের শারদীয় "অনুবাদ" পত্রিকায় (ত্রয়োদশ বর্ষ) তিতাস চৌধুরী তাঁর "নজরুল-রবীন্দ্র সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে লিখেছেন—

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সপ্তম সাক্ষাৎকারটি ঘটে ১৯৩১ সালের ২০শে জুন—দার্জিলিঙে। নজরুল দার্জিলিঙে "বর্ষবাণী" পত্রিকার সম্পাদিকা জাহানারা চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সবান্ধবে। সেই সুবাদেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের দেখা হয়।'

এখানে দেখছি, দার্জিলিঙে রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাৎকারের দিনটা নিয়ে এই লেখকদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আমার মনে হয়, তিতাস চৌধুরী বর্ণিত তারিখটাই ঠিক।

রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৭ সাল বা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে জুন-জুলাইয়ে দেশে ছিলেন না, বিদেশভ্রমণে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯৩১-এই ওই সময় দার্জিলিঙ গিয়েছিলেন। আবদুল আজীজ আল-আলম তাঁর সম্পাদিত "নজরুল রচনাসম্ভার" ২য় খণ্ড গ্রন্থের পরিশিষ্টে "কয়েকটি অটোগ্রাফ" অধ্যায়ে নজরুলের সাতটি ছোটো কবিতা ছেপেছেন। এখানে মুদ্রিত ৫ ও ৬ সংখ্যক কবিতায় দেখা যায়—নজরুল কবিতা লিখে কবিতার শেষে স্থান ও তারিখ দিয়েছেন যথাক্রমে—দার্জিলিঙ ১৬.৬.১৯৩১ ও দার্জিলিঙ ২০শে জুন ১৯৩১ (ইং), (পৃ ২৬৪)।

এখানে দেখা যাচ্ছে, ১৯৩১ সালে দার্জিলিঙে রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাৎকারের সময় সেখানে মন্মথ রায়ও উপস্থিত ছিলেন। ১৮৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা "স্বদেশ" পত্রিকা কোথাও না পাওয়ায়, সজনীকান্ত দাস তাঁর "আত্মস্মৃতি"তে যা লিখেছেন এবং অখিল নিয়োগী আর আবদুল কাদির যা-যা বলেছেন, সেসব ঠিক কিনা, এবং এঁদের বলা কথা ছাড়া রবীন্দ্র-নজরুলের মধ্যে আরও কী-কী কথা হয়েছিল, জানবার জন্য আমি একদিন মন্মথদার বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি আমার পূর্ব-পরিচিত, তাঁকে দাদা বলতাম।

আমি মন্মথদাকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা দাদা, দার্জিলিঙে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের যে সাক্ষাৎ হয়, আপনিও তো তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন? এই বলে, সজনীকান্ত দাস তাঁর "আত্মস্মৃতি"-তে সজনেফুল আর মুরগী-র কথা নিয়ে যা লিখেছেন, তা বললাম। বলেই জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাদের সামনে রবীন্দ্রনাথ কি ওই ধরনের কথা বলেছিলেন?

শুনে মন্মথদা বললেন—'সেদিন কী সব কথা হয়েছিল আজ আর কিছু মনে নেই। তবে একটা কথা এখনও পরিষ্কার আমার মনে আছে। সেটা বলছি—'দার্জিলিঙে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে বললেন—আপনি এসেছিলেন বলেই বাংলা সাহিত্য অমর হল। অমর হয়ে থাকবে।'

'রবীন্দ্রনাথ বললেন—তা বলা যায় না। কার সাহিত্য অমর হবে, আর কার সাহিত্য হবে না। তবে আমার মনে হয়, আমার কিছু গান থেকে যাবে।'

আমার সঙ্গেই কাগজকলম ছিল। আমি মন্মথদার মুখে ওই কথা শুনে বললাম—কথাগুলো আবার বলুন, আমি লিখে নিই।

তিনি আবার বললেন, আমি লিখে নিলাম।

পরে বললেন, 'কাগজটা দাও। আমি সই করে দিই।'

আমি কাগজটা দিলে তিনি লেখাটা পড়ে, তাতে নিজের নাম সই করে দিলেন।

এরপর মন্মথদা আবার বললেন—'আর-একটা কথা হয়েছিল মনে পড়ছে। আমার নাটকের গান নিয়ে তিনি আমাকে কয়েকটা কথা বলেছিলেন। আমি গান লিখতে পারি না। আমার চার-পাঁচটা নাটকে নজরুল গান লিখে দিয়েছিলেন। আমার "কারাগার" (১৯৩০) নাটকেও নজরুল গান লিখে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের ওই সাক্ষাতের কয়েক মাস আগে মনোমোহন থিয়েটারে আমার "কারাগার" নাটক মাত্র ১৮ রজনী অভিনয়ের পরই তখনকার ব্রিটিশ শাসকের রাজরোষে অভিনয় নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এতে নজরুলের গানগুলি আরও জনপ্রিয় হয়ে জাতির মর্মবাণী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ওই গানগুলি নিয়েই কটা কথা বলেছিলেন।

এরপর বললেন, আমি কখনো গান লেখার চেষ্টাও করি নি। তবে জীবনে একবার একটা ছড়া লিখেছি মাত্র। এই বলে, তিনি তাঁর তখনকার সমস্ত লেখার ভাণ্ডারী তাঁর স্নেহের পৌত্রীকে বললেন, 'সেই ছড়াটা বার কর।' তিনি লেখাটা বার করলে, মন্মথদা তাঁকে বললেন—ওইটা আমার প্যাডের কাগজে লেখ। গোপালকে ছড়াটা দেব।

মন্মথদার প্যাডের কাগজে তাঁর পৌত্রী লিখলেন—

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ
বিশ্বযুদ্ধ দেখে কাৎ।
চলে এলেন জোড়াসাঁকো
ভাঙা মন জুড়লো নাকো।
অভিমানেই গেলেন চলে
সভ্যতাটা অসভ্য বলে।
হায় হায় রবীন্দ্রনাথ
তোমার বিহনে আমরা অনাথ।
ফিরে এস আমাদের বুকে
পৃথিবী থাক চিরসুখে।

১২.৪.৮৬

এরপর মন্মথদা ওই লেখাটা নিয়ে লেখার পাশে লিখলেন—আমার লিখিত জীবনের প্রথম ছড়া এবং বোধকরি এই শেষ।

মন্মথ রায়

পরে আবার এর শেষে লিখলেন—

শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
সাহিত্যসিন্ধু
মন্মথ রায়

আমার হাতে কাগজটা দিলে, আমি পড়ে বললাম, দাদা, আমার নামের শেষে আবার এ কী লিখেছেন?

বললেন—ঠিক আছে।

১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা "স্বদেশ" পত্রিকায় নজরুলের লেখা না পেলেও মন্মথদার এই কথা এবং অখিল নিয়োগী এবং আবদুল কাদিরের লেখা থেকে দার্জিলিঙে রবীন্দ্র-নজরুলের কথোপকথনের কিছু-কিছু পেলাম। আর পাওয়া যাচ্ছে—১৩৩৮ সালের কার্তিক মাসের "শনিবারের চিঠি"র "সংবাদ সাহিত্য" বিভাগ থেকে।

আশ্বিনের "স্বদেশে" নজরুলের লেখা পড়েই "শনিবারের চিঠি"র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস পরের মাসে তাঁর কাগজে মূলত নজরুলের লেখা থেকে রবীন্দ্রনাথের উক্তিগুলি উদ্‌ধৃত করে-করে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেছিলেন। এই প্রবন্ধে আগে সজনীকান্তর "আত্মস্মৃতি" থেকে রবীন্দ্রনাথের উক্তি বলে যে 'সজনেফুল' ও 'মুরগী'র কথা উদ্‌ধৃত করেছি, সে কথাও সজনীকান্ত উদ্‌ধৃতিচিহ্ন দিয়ে "শনিবারের চিঠি"তেও উদ্‌ধৃত করেছেন দেখছি।

আর একটা কথা—অখিল নিয়োগী এবং আবদুল কাদির তাঁদের লেখায় যে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে ইতালীয় কবি 'দানেনৎসিও'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, কেন বা কী কথার পর রবীন্দ্রনাথ ওই তুলনা করেছিলেন সজনীকান্তর "সংবাদ সাহিত্যে"র উদ্‌ধৃতি থেকে তা পরিষ্কার জানা যায়। সজনীকান্ত লিখেছেন—'তিনি (নজরুল) বললেন—আচ্ছা আপনি যখন ইটালি গিয়েছিলেন ড্যানানৎজি'র সঙ্গে কোনো দিন কথা হয়েছিল?

'কবি বালকের (?) মতো হেসে বললেন, তাঁর সঙ্গে দেখা হবে কী করে? তিনি যে তোমার চাইতেও পাগল।··· এমন বিলাসী কবি জগৎ আর পেয়েছে কিনা সন্দেহ।···একবার তিনি ফ্রান্সে গিয়েছিলেন। দলে-দলে সে দেশের মেয়েরা শুধু তাঁকে চোখের দেখা দেখবার জন্যে পাগলের মতো ছুটল।'

এখানে সজনীকান্তের এই উদ্‌ধৃতির প্রথমেই 'তিনি' (নজরুল) দেখে মনে প্রশ্ন জাগছে—তাহলে কি নজরুল আশ্বিনের "স্বদেশে" তাঁর প্রবন্ধে নিজেকে উত্তম পুরুষরূপে ব্যবহার না করে প্রথম পুরুষরূপে ব্যবহার করেছিলেন?

যাই হোক, গ্রন্থটা পেলে দেখা যেত নজরুল কিভাবে কী-কী কথা লিখেছিলেন।

সজনীকান্তর "সংবাদ সাহিত্যের" উদ্ধৃতি থেকে রবীন্দ্রনাথের সেদিনের আরও দু-একটা কথা পাওয়া যাচ্ছে। সজনীকান্ত লিখেছেন, 'এই সাক্ষাৎকালে রবীন্দ্রনাথ সলজ্জে হাস্যের সহিত বললেন-"ছবি হ'ল আমার তৃতীয় পক্ষ।"'

কবির এই কথা নিয়ে সজনীকান্ত তাঁর কাগজে মন্তব্য করেছিলেন—

'তাই! আমরা এতকাল ভাবিয়া বিস্মিত হইতেছিলাম যে ধরার দুলাল রবীন্দ্রনাথ ধূলামাটির ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া ঊর্দ্ধ শূন্যলোকে এমনভাবে বিচরণ করেন কি করিয়া? দুই পক্ষের জোরেই পক্ষীরা যেভাবে শূন্যমার্গে উড্ডীয়মান হয়—তৃতীয় পক্ষ থাকিলে তা কথাই নাই।'

এবার সজনীকান্ত তাঁর "সংবাদ সাহিত্যে" আবার উদ্ধৃতি দিয়েছেন—'তারপর দূরে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললেন—কবির উদয় পূর্বাকাশে গানের ভিতর দিয়ে; কিন্তু অস্ত তার পশ্চিমে রঙের খেলার মাঝখানে। তাই রঙীন যাকিছু সব ওদেশেই পাঠাই।'

দার্জিলিঙে রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাতের কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ যখন ইউরোপে ছিলেন, তখনই ১৯৩০ সালে ইউরোপে তাঁর আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়েছিল। সেই তাঁর আঁকা ছবির প্রথম প্রদর্শনী। সজনীকান্তর উদ্ধৃতিতে 'রঙীন যা কিছু সব ওদেশেই পাঠাই'—ইত্যাদি দেখে মনে হয়, সেদিন রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন আগে ইউরোপে প্রদর্শিত তাঁর ছবির কথাই ইঙ্গিতে বলেছিলেন। সজনীকান্ত দাসের "আত্মস্মৃতি" তাঁর "শনিবারের চিঠি", অখিল নিয়োগীর লেখা, রফিকুল ইসলামের "নজরুল জীবনী" প্রভৃতি থেকে দার্জিলিঙে রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাৎকারের কিছু-কিছু কথা জানা গেল। আর অতিরিক্ত কিছু জানা গেল-নাট্যকার মন্মথ রায়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁর মুখ থেকে।

১৩৩৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা "স্বদেশ" পত্রিকাটি পেলে স্বয়ং নজরুলের লেখা থেকে সেদিনের রবীন্দ্র-নজরুল সাক্ষাতের আরও অনেক কথা জানা যেত।

অনেক খোঁজ করেও "স্বদেশ" পত্রিকার ওই সংখ্যাটি কোথাও পাই নি। "চতুরঙ্গের" পাঠক-পাঠিকাদের কারও সন্ধানে ওই পত্রিকাটি থাকলে, অনুগ্রহ করে যদি জানান তো বিশেষ বাধিত হব।

অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা

সংগ্রহণ (ঘ)

অরুণা হালদার

মনোথীইজম—মনোথীইজম বা একেশ্বরবাদ উদ্ভূত হয়েছে, অনুমান করা যায়, মানবসমাজ এবং মানব-জীবনের আর্থ-সামাজিক আর কিছুটা রাজনৈতিক চেতনার স্থিতির উপর নির্ভর ক'রে। তবে একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, মনোথীইজম আবির্ভূত হওয়া মানেই পূর্বাপর মতবাদগুলি শেষ হয়ে গেছে —তা একেবারেই নয়। সচল নদীস্রোতের মতো সমস্তটা যুক্ত আছে উৎস থেকে নিয়ে অধুনা প্রবাহের সঙ্গে মিলিত মিশ্রিত হয়ে। যেখানে একেশ্বরবাদ গৃহীত হয়েছে সেখানেও পূর্বাপর ধর্মচর্যার কিছু না কিছু ছাপছোপ রয়ে গেছে। তাদের নূতনভাবে সংযোজিত করে গ্রহণ করা হয়েছে বলাই ভালো।

আমরা আগে উল্লেখ করে এসেছি অসভ্য যুগ আর বর্বর যুগের কথা। বর্বর যুগের মানুষেরা সত্যই সভ্য, সংস্কৃতিমান এবং ভাষাসাহিত্যমাধ্যমের অধিকারীও বটে। তাদের সমাজে কেউ প্রতিষ্ঠিত রাজা, কেউ সার্বভৌম সম্রাট (রোম), কেউ বা ছোটো-ছোটো রাজ্যের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত সর্দার দলপতি (আরবভূমির ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি)। রাজা, রাজপুরোহিত, রাজানুচর, মন্ত্রী প্রভৃতি সকলেই বিশেষ-সুবিধাভোগী। একটু সুবিধা হলেই আশে-পাশের ভূখণ্ড অধিকার করার ঝোঁক বা দুর্বলতা সবারই থাকে, এদেরও ছিল। (আধুনিক কালেও তা অজানা নয়।) অধিকার রক্ষা করা বা ভোগ করার মধ্যে প্রতাপের স্বীকৃতি আছে। এই প্রতাপ-হারানো মানুষেরা বন্দী অত্যাচারিত অনাহারক্লিষ্ট জীবন নিয়ে প্রতাপান্বিত ক্ষত্রপ বা সর্দারদের দাস বলে গৃহীত হল। এই নূতন ধরনের সমাজব্যবস্থায় শাসক-শাসিত ছিল ঠিকই, কিন্তু এ সমাজব্যবস্থার সবটাই দাস-প্রধান। দাসেদের শ্রমনির্ভর এই সমাজকে প্রথমাবস্থায় দাসসমাজ বলা হত, এবং পরবর্তী অবস্থায় (বর্বর যুগের শেষ ভাগে) গ্রীকো-রোমান রাজপুরুষেরা দাসেদের সাময়িক উত্থান আর বিদ্রোহের কারণে বিব্রত এবং বিপন্ন হয়ে অবশেষে দাসদের খানিকটা আইনানুগ স্বাধীনতা দিলেন। অবশ্য তাঁরা এও জানতেন যে নিঃস্ব, নির্বিত্ত দাসেরা বাধ্য হয়েই তাঁদের জমিদারি বা ল্যাটিফানডিয়ায় কাজ করতে বাধ্য হবে। তবে তাদের খাওয়ার ভার আর তাঁদের নিতে হবে না। এই প্রথাটা বেশ পরিপক্ক অবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক বা ফিউডাল সমাজ বলে পরিকীর্তিত হল।

সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব সকল দেশে সমভাবে হয় নি। সে কারণে একেশ্বরবাদও একই রূপে সর্বত্র দেখা দেয় নি। যেমন ধরা যাক আরব মরুভূমির আঞ্চলিক খণ্ড-রাজ্যগুলিতেও শাসক ছিল কতকটা দলপতির মতো। সেই সর্দারের অনুচররাও ঝড়ের মতো অপ্রতিহতগতি—অশ্বপৃষ্ঠে তাদের যাওয়া-আসা। হাতে তরবারি, চরিত্রে কঠোর নিষ্ঠুরতা এবং লুণ্ঠনে বা বন্দীদের হত্যায় তারা নির্দ্বিধায় স্পর্ধিত। এই সর্দার আর অনুচরের প্রতীকীভূত হয়ে এসব দেশেও এক ধরনের মনোথীইজম বা একেশ্বরবাদ দেখা দিয়েছিল। ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এসব দেশে ইসলাম প্রবর্তিত হয়। ইসলামি মনোথীইজমের একতাবদ্ধন এক সময় অশেষ বেগবান এবং শক্তিশালী হয়ে ওঠে। হজরত রসুলের পর থেকে ক্রমে তা পশ্চিমে স্পেন থেকে পূর্বে চীন প্রান্ত এবং ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত প্রসারিত সাম্রাজ্যের আকার নিতে থাকে। যেভাবেই হোক, এখন থেকে ধর্ম এবং ধর্মপ্রচার দুটো অন্যোন্যনির্ভর হতে থাকে।

আনুমানিক অনুসন্ধানে আমরা যেটুকু উপাদান হাতে পাই তাতে মনে হয়, আফ্রিকা মহাদেশের ঈজিপ্ট থেকেই এই মনোথীইজমের উৎপত্তি এবং বিকাশ। ঈজিপ্টের ফারাওদের মধ্যে বহুদেববাদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ব্যতিক্রমও তো হয়। দেখা গেল, আঁখেন আমন (আমনের বা সূর্যের সেবক) নামের এক ফারাও প্রচলিত ধর্মমতের সংস্কারসাধনে ব্রতী হলেন। তাঁর সময় বহুদেববাদ বন্ধ করা হল। ব্যাপারটা পুরোহিততন্ত্রকে অসুবিধায় ফেলে বিদ্রোহী করে তুলল। ফারাও নিজের নাম বদল করে হলেন আঁখেন আটন (আটন বা বিমূর্ত জ্যোতির্বলয়ের উপাসক)। পুরোহিততন্ত্রের চক্রান্তে এই বিমূর্ত শক্তির উপাসনা চলল না। সাধারণ মানুষেরা স্বভাবত ধর্মভীরু। এবং জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে পুরোহিতদের কলাকৌশলনির্ভর। এই বিদ্রোহকে চালিয়ে নিলেন হোরেম হেব বলে এক সেনাপতি। বিদ্রোহ সফল হল এবং রাজ্যচ্যুত আঁখেনাটন নির্বাসিত ও পরে নিহত হলেন। কিন্তু তিনি সর্বপ্রথম বিমূর্ত মহাশক্তি একদৈবতের উপাসনা-পদ্ধতির প্রচারক এবং প্রচলনকারী বলে পরিকীর্তিত হলেন। অতএব একেশ্বরবাদের বীজটা রয়ে গেল।

বলা হয়, ঈজিপ্টের রাজপরিবারের ঘাটে একটি শিশু প্যাপিরাসের বাক্সে ভেসে আসে। এই শিশু অবশ্যই সুরক্ষিত কোনো দৈবশক্তিদ্বারা প্রেরিত—এমনই একটা বিশ্বাস করা হয়। ইনি ওই রাজ-পরিবারের এক রাজকুমারীর কাছে পালিত হন, এবং শিক্ষা-দীক্ষাও লাভ করেন। ইনিই জুইশ সম্প্রদায়ের এক প্রেরিতপুরুষ বলে পরিকল্পিত মোজেস। মিশরীয় দাসসম্প্রদায়ের অধিকাংশই জুইশ সম্প্রদায়ের লোক, এবং তারা কষ্টক্লিষ্ট শ্রমের বিনিময়ে ক্লেশজর্জর দাস হয়ে, নিষ্ঠুর অত্যাচারের পাত্র হয়ে মিশরে দীর্ঘকাল ধরে ছিল।

মোজেস্, যেভাবেই হোক, একেশ্বরবাদের সমর্থক হন এবং সেই একমদ্বিতীয়ম্ আলেহ্ বা অলমাইটি বা সর্বশক্তিমান শক্তিকে ঈশ্বরকল্প বলে জুইশ নুকুলকে তাঁর পরিগণ হিসাবে দীক্ষিত করেন, এবং সংগঠিত করেন। ইতিপূর্বে যেভাবে বা যে কারণেই হোক, জুইশ বা ইস্রায়েল নুকুল সর্বতোভাবে অবদমিত তো ছিলই, এবং তারা তাদের পূর্ব ঐতিহ্য হারিয়ে (তাদের মতে) বহুদেববাদীও হয়ে উঠেছিল। মোজেস এলেন তাদের পরিত্রাতা এবং সংগঠক

ড. অরুণা হালদারের জন্ম ৮ই মে, ১৯১৮। তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রাক্তন রীডার। ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃত এবং বাঙলা ভাষা বিষয়ে তিনি ছিলেন রাশিয়ার লেনিনগ্রাদ ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং প্রফেসর (১৯৬২—৬৪)। লেকচারট্যুর করেছেন জার্মানির হামবোল্ড ইউনিভার্সিটি এবং চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রাগ ইউনিভার্সিটিতে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসাবে। তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয়। এই বিষয়ে অনুশীলনের গভীরতা তাঁকে বিশেষকের মর্যাদা দিয়েছে।

হিসাবে। তিনিই ফারাও আর তাঁর পরিকরদের হাত থেকে এই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নির্দেশে, তাঁর প্রতিভূ হয়ে, ইজরায়েলদের বার করে নিয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে, মোজেস-প্রবর্তিত এই একেশ্বরবাদ এ-জাতীয় ধর্মমতের প্রথমতম প্রকাশিত উদাহরণ হিসাবে স্বীকৃত। এটি রিভীল্ড রিলিজনও বটে। ঈশ্বরসত্তা মোজেসকে আগ্নেয় অক্ষরে সমুৎকীর্ণ দশটি আদেশ তাঁর পরিকরদের জন্য প্রদান করেন। এই ধর্মমতের ছত্রচ্ছায়ায় থেকে মোজেস ফারাওদের হাত থেকে ইজরায়েলদের বার করে আনেন, এবং নানা বিপদের মধ্যে দিয়ে, অশেষ কষ্ট আর ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে অবশেষে সিনাই পর্বত পার হয়ে তাদের অপহৃত দেশে এসে প্রতিষ্ঠিত করেন। জুইশ মন্দির বা সিনাগগ নির্মিত হয়। ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিজ্ঞ সম্রাট সলোমনের সময় উক্ত ধর্মমন্দির ভালোভাবে নির্মিত হয়। এই সঞ্চরমাণ নুকুল বহুবার তাদের দেশের এবং মন্দিরের অধিকার হারিয়েছে, আর পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছে—এ ইতিহাস আমাদের চোখের সামনেই ঘটেছে, তা আমরা লক্ষ করেছি। বাবিলীয়গণ অধিকার করার পর মন্দিরপ্রাঙ্গণে শূকরবলি হয়, আর শূকরমুখ দেবতার মূর্তি পবিত্র স্থানে রাখা হয়। মাকাবিগণ (পূর্বে তাঁদের কথা বলেছি) সেই অপবিত্র স্থানকে স্বীয় আত্মদানে পুনর্বার সুসংস্কৃত করেন।

জুইশ ধর্মমত পরিচ্ছন্নভাবে বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেনটে বিধৃত আছে। স্রষ্টা ঈশ্বর থেকে শুরু করে তাঁর কীর্তির ধারক-প্রচারক নবী বা প্রফেট-গণের বাণী ও দেশনা নিয়ে এই মহাগ্রন্থ। এই গ্রন্থের পরে নবীন সংযোজনকে নিউ টেস্টামেনট বলা হয়। একথায় আমরা পরে আসব—খ্রীষ্টীয় একেশ্বরবাদের আলোচনার সময়। জুইশ মতবাদে টালমুড আর টোড়ার (অনেকটা কুরান আর হাদিসের মতোই বলা যায়।) আধারে ধর্মমত আর ধর্মদেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

ডীইজম

অতি সংক্ষেপে এই ইতিহাসকথা বলার পর আমরা মনে করতে পারি যে, একেশ্বরবাদের প্রবর্তনায় এই প্রথম পদক্ষেপের দিক থেকে ঈশ্বর এবং তাঁর পরি-গণের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিশেষভাবে সুদূর আর বিশেষভাবে ভয়াল। এই সর্বশক্তিমান অবশ্যই অদৃশ্য—বোধ করি বিদেহ এবং অদ্বিতীয়। (কখনও-কখনও এই একেশ্বর বা ইয়াভের ভীম-মূর্তি কলকাতার ছবির দোকানে পূর্বে দেখা যেত।) তিনি ভক্তের পক্ষেও শক্ত ভগবান, এবং তাঁকে অমান্যকারীর পক্ষে ভীম দণ্ডদাতা। ভগবান আর ভক্তের সম্পর্কটা দূরত্ব এবং গুণগত ব্যবধানের বিশিষ্টতাময়। ধর্মীয় বিচারে এজাতীয় একেশ্বরবাদের একটা নাম হল ডীইজম। পরে আমরা দেখব ইসলামও একপ্রকার ডীইজম। দুটির ইতিহাস কিছুদূর পর্যন্ত এক।

ডীইজমের অন্য একটি শাখা ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ সময়ে নূতন করে জেগে ওঠে। এটিই ইসলাম। আজকের দিনের ইসলামের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ। তৎকালীন আরবদেশের পরিবেশে ছোটো-ছোটো দলকে তিনি সংঘবদ্ধ করে তোলেন। এই সংঘশক্তির উৎস ছিল তাঁর আল্লাহ্, একমেবদ্বিতীয়মের প্রতি, একেশ্বরের প্রতি চিরানুগত্য। একদিক থেকে দেখতে গেলে, জুইশ ধর্ম বা জুডাইজম এবং ইসলাম—দুটিরই উৎস এক। দুই একেশ্বরই অদ্বিতীয় এবং তাঁর অনুচরদের একান্ত আস্থাভাজন। তিনি প্রবলশক্তিমান, সর্বত্রগামী এবং সকল অন্যায়ের প্রতিষেধকারী। তাঁর অনুচরদের তাঁরই মতে চলার কথা—এটা একেবারে বাধ্যতামূলক। ন্যায়-অন্যায়ের নীতি অতি কঠিন এবং অনতিক্রমণীয়; কারণ সেটা সেই এক অদ্বিতীয় বিমূর্ত শক্তি ঈশ্বরের বিধান। বস্তুত, এই দুই ক্ষেত্রে এক ধরনের প্রবল নিয়ন্ত্রণশক্তি ঈশ্বরকে তাঁর অনুচর-দের সঙ্গে যুক্ত করে রেখেছে। প্রফেট বা নবীদের সকলকেই, এমনকী যীশুখ্রীষ্ট বা ইশাকে পর্যন্ত

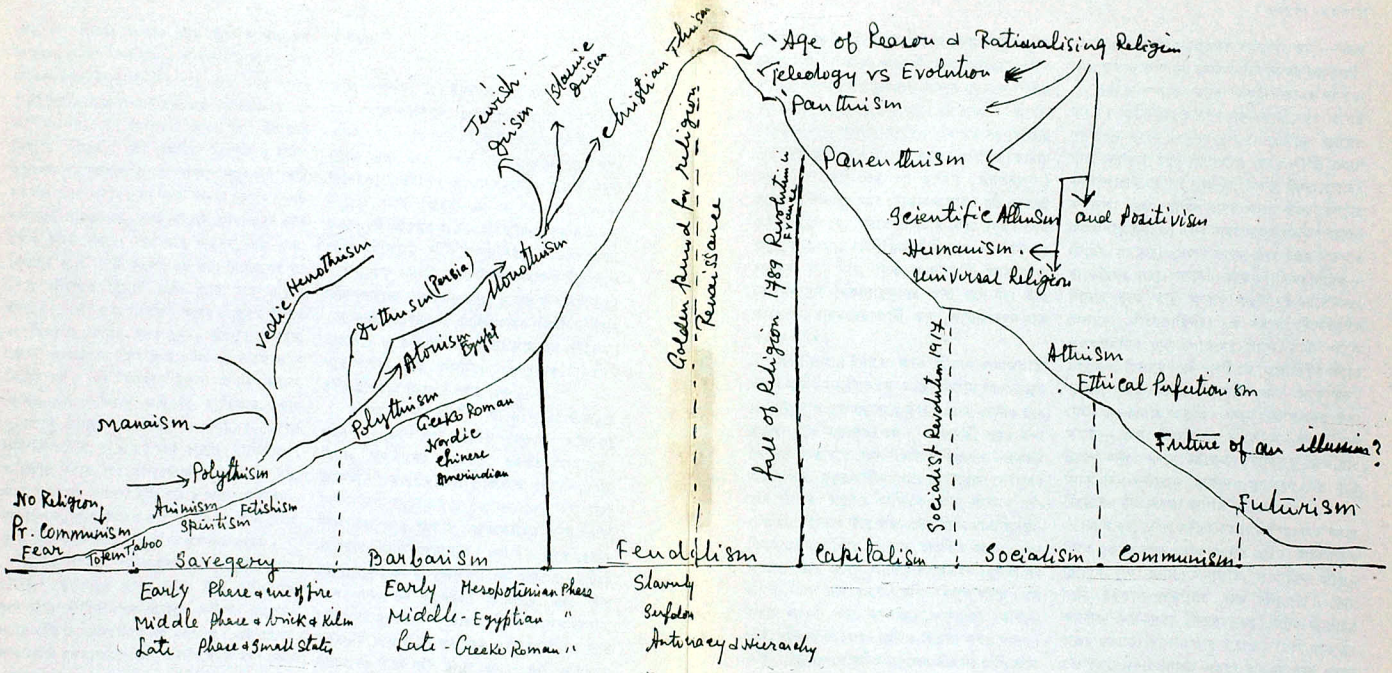

CHART 3

The chart indicates a rough pathwork for religion against the background of historical development of human society and human civilisation.

This crosssectional study shows that there was no religion at the dawn of human life; that religious consciousness developed through the complexity in environment and assumed complexity itself; that religion reached the most glorious stage in feudal period and underwent a gradual setback along with the march of science.

The chart further shows that religion then began to enjoy a peaceful coexistence with reason and philosophy along the march of science.

ইসলাম স্বীকৃতি দিয়েছে। হজরত রসুল কোনো মতে শেষ নবী। (কারণ পরবর্তী যুগে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ইসলাম মত দুটি শুধু প্রধান মতবাদে বিভক্ত হয়ে যায়, তাই নয়, তাদের প্রত্যেকটির আবার ছোটোখাটো মতবাদ আছে। (অন্তত সব মিলিয়ে ৭২-৭৪টি হবে।) এ ছাড়াও, হজরত-প্রবর্তিত কোরান এবং তার ভাষ্যব্যাখ্যা বা হাদিস (নীতিবাচক) অনেকটা টালমুড আর টোড়ার মতোই। দুটি ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে যে, পরমেশ্বর মহান কিন্তু সুদূর। সেই সুদূরকে একমাত্র সর্বশক্তিমান হিসাবে সভয় বিস্ময়ে অনুভব করা যায়, কিন্তু কাছাকাছি আসার বা কোনোভাবে নৈকট্যানুভূতির প্রশ্ন ওঠে না। তাঁর কাছে শুধু মানুষ দয়াপ্রার্থী হয়ে আত্মনিবেদন মাত্র করতে পারে।

সর্বশক্তিমান ইয়াভে তাঁর আদেশ-অমান্যকারী প্রথম মানব-মানবীকে যে সাজা দিলেন পাপের জন্য—সেই পাপ পুরুষানুক্রমে তাঁর রোষের প্রতীক হয়ে মানবসমাজে অনুপ্রবিষ্ট হল। প্রতিস্পর্ধী শয়তান বা ডেভিল কিন্তু রয়ে গেল—সেই লুসিফারও—একজন অধঃপতিত দুষ্কৃতকারীর প্ররোচনাদায়ক দেবদূত। তবে ইয়াভে অনুতপ্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন। সর্বশক্তিমান হিসাবে তাঁর অনুচরদের তিনি নানা অবস্থা-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে শান্তিতে ব্যবস্থিত করেন, এমন আশ্বাস তাঁর মধ্যে আছে। ইসলামেও এগুলি সব আছে, এবং তার চেয়ে বেশি কিছুও আছে। সে কথায় আমরা পরে আসছি। আপাতত দেখি—দুইটি ধর্মমতই ডীইজম—দুটিতে ভিন্নতা অবশ্য আছে। দুটিই সেমেটিক-হেমেটিক নৃকুলের জীবনের প্রতিফলন—শুষ্ক মরুভূমির কঠিন জীবনদর্শনের আনুকূল্য করার জন্যই যেন এরূপ পরমেশ্বরের কল্পনা। এসব ছোটো-ছোটো নৃকুলের জীবনধারণের উপযোগী শক্তিমান দলপতির আদলে তাদের ঈশ্বরেরও সৃষ্টি হয়েছে। পাপপুণ্যের ফলস্বরূপ আছে দোজখ আর জন্নত—পাপের ফলে জ্বলন এবং পুণ্যের ফলে বেহেশত মানবাত্মার প্রাপ্য। বেহেশত সর্বসুখের স্থান—শীতল জল, সুস্বাদু ফল এবং রমণীয় নারী তাদের কল্পনাস্বর্গ।

ইয়াভে সম্পর্কে আরো একটা ভয়ানক আশঙ্কা থাকে। তিনি তাঁর আদেশ-লঙ্ঘনকারীদের জীবন্তেই দণ্ডবিধান করেন। সেসব দেশ, সেসব মানুষ অন্যদের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়; ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; শাস্তি পেয়ে বন্দীদশাগ্রস্ত হয়। (তুলনীয়, মিশরে ইজরায়েলদের বন্দীদশা এবং বাবিলীয়দের দ্বারা ইজরায়েলদের বন্দীদশার কথা।) এসব সময় অবশ্য তিনি পরোক্ষে তাদের সহায়তা প্রেরণ করেন তাঁর প্রিয় দূতমুখে বা নবীদের দ্বারা। সম্পর্কটা অনেকখানি মর্যাদাময়—পিতার দূরহ আর অবোধ সন্তানদের ভালোমন্দ-মেশানো জীবনকাহিনী। এ সমাজ বিশেষভাবে পুরুষপ্রধান। এই পৌরুষের পাশে নারী থাকে সহায়িকা হিসাবে। দুই-চারটি যে বিদ্রোহিণীর সন্ধান পাওয়া যায়—তাঁরা স্বাভাবিক নন—আকস্মিক। যেমন রুথ-রাহার প্রভৃতি। ফল্‌ন্ উইমেনদের কথা আছে—যেমন ডিলাইলা, শালোমে এবং এঁদের উদ্দেশ্য মন্দ। ফল্‌ন্ উইমেনদের পাথর ছুঁড়ে মারার নিয়ম ছিল—তাঁরাও নিজেদের মুখাবরণ ছিন্ন করে নিজেদের দীন অবস্থা জ্ঞাপন করতেন।

মনে হয়, জুইশ নবীরা একধরনের সাধক। অপর দিকে হজরত রসুল লোকনায়কও বটে। লোকনায়ক হিসেবে যুদ্ধে তিনি সেনাপতি, সামাজিক জীবনে তিনি ইহকাল-পরকালের জন্য উপদেষ্টা। তাঁর আহ্বানে শত-সহস্র সৈন্যসমাবেশ ঘটে—আল্লাহর রাজ্য, ধর্মরাজ্য স্থাপনা তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি মানতেন এবং বলতেন—ইসলামই সত্য। অতএব তার প্রচার এবং স্থায়িত্ব প্রয়োজন।

এই ধর্মের জয়যাত্রার পেছনে ছিল নবজাগ্রত এক মহাজাতির শক্তির ইতিহাস। ততদিনে ইয়োরোপে প্রসারিত খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে ইসলামের সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। দশম শতাব্দী পর্যন্ত তার আলোড়ন আমরা দেখতে পাই। ইসলামের

জয়ধ্বজার নীচে জিতলে গাজী, এবং মরলে শহীদ। এরকম ধারণা নিয়েই ইসলামের সেনাগণ এগিয়ে গেছেন। ভারতে তাঁদের আগমন হয় প্রথমে অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে (আনুমানিক)। গুজরাত পাটনে এই আগমন হয়েছিল। মনে হয়, ইতিপূর্বেও ইসলামধর্ম বণিকদের সহায়তায় বড়ো-বড়ো নৌকার বহর নিয়ে চলে গিয়েছিল সুদূর মালাবার উপকূলে, এবং তা পেরিয়ে ইন্দোনেশিয়া এবং চট্টগ্রাম বন্দরেও। বহু দীর্ঘ কালের অবস্থানের সূচনা কল্পনা করে একথা অনুমাননির্ভর মনে করি। সমুচিত প্রমাণ আছে কিনা জানি না। এই সুদূরপ্রসারিত সাম্রাজ্যের সঙ্গে-সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় এক আশ্চর্য সংস্কৃতি। তাতে শিল্প-সাহিত্য-সূক্ষ্মরুচিসহ কৃষ্টির কোনো নিদর্শনই বাদ পড়ে নি। তেমনই বাদ পড়ে নি মধ্যযুগীয় নিষ্ঠুরতার নিদর্শনও। এই দুই বিপরীত মেরুর সমন্বয়ে ঐসলামিক শিক্ষা-দীক্ষা, শিক্ষাকেন্দ্র, আশ্চর্য সুন্দর ছোটো-বড়ো শিল্পনিদর্শন—মহৎ স্থাপত্যকলা এবং গভীর রোমানটিক প্রেমকথাকাব্য যা বোধ করি মরুভূমির নায়কের বা নায়িকার পক্ষেই সম্ভব—রচিত হতে থাকে। এই রোমানটিক প্রেমকথা, সম্ভবত যাদের দিনরাত অস্থির রণোন্মাদনার মধ্যে কাটে—দেশপ্রেম বা ধর্মানুগত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এমন অপূর্ব রোমান্স তাদের মধ্যেই সম্ভব।

এ ছাড়াও স্থাপিত হয় রাজ্য এবং সাম্রাজ্য—রাজকীয় রীতিনীতি আর শাসনব্যবস্থা। আবাসিদ পর্বের মহৎ পরিকল্পনা স্থায়ী রাজ্য এবং সাম্রাজ্য গড়ার ভিত্তিস্বরূপ মনে করা ভুল হবে না। রাজ্য সুরক্ষিত রাখা, গড় ও দুর্গ এবং প্রাকার, পরিখা নির্মাণ, বাস্তুকলা, জ্যোতির্বিদ্যা, বিজ্ঞান-গণিত আর দর্শনশাস্ত্রানুশীলন কোনোটাই বাদ পড়ে নি। মানব-সংস্কৃতির ইতিহাসে গ্রীক-রোমান নুকুলের পর সামন্ত-তান্ত্রিক যুগের একটা বড়ো অংশ ব্যাপ্ত করে আছে এই ঐসলামিক পর্ব। এর মধ্যে শুধুমাত্র ধর্ম নয়—ধর্মকে আশ্রয় করে একটা মহৎ বিজ্ঞান-দর্শন, সাহিত্য-ইতিহাস রচিত হয়ে রয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না—জ্ঞানবিজ্ঞানের নবজাগৃতি ইয়োরোপে যা প্রসারিত হল—রেনেসাঁস যুগে তা প্রসারিত হয়েছিল কনস্তান্তিনোপল থেকে—যেখানে ঐসলামিক সভ্যতা আর জ্ঞানবিজ্ঞান কেন্দ্রীভূত হয়েছিল, এবং সেখান থেকেই আবার নূতন করে পশ্চিম দিগন্তে প্রসারিত হয়ে গেল। ক্রুসেডের যুদ্ধকে আমরা যেন একচক্ষুতে দেখে থাকি। আর সেইজন্যই মধ্য এশিয়ার এই মহৎ গৌরবের উৎস ইসলাম এখনও পর্যন্ত তার যথার্থ সমাদর লাভ করতে পারে নি—যা তার অবশ্য প্রাপ্য। আর এসবের মূলেই ছিল আরবি ভাষা যা একত্র করেছিল এই-ভাষাভাষী সমগ্র নুকুলকে। এই সুমহান মানবজাগৃতির কালে, এক চীন আর খানিকটা ভারতবর্ষের অংশবিশেষে বিকশিত সভ্যতা-সাহিত্য বাদ দিলে, সমগ্র ইয়োরোপীয় মধ্যযুগ সে সময় অসভ্য বর্বরতায় তমসাচ্ছন্ন বলা যায়।

ঐসলামিক ডীইজমের প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বলা প্রয়োজন। এই মতবাদের আধার এখনও সেই কোরান এবং হাদিস। এই মহাগ্রন্থ লেখার জন্য আশ্চর্য লিপিকর সম্প্রদায়ের কাজ (ক্যালিগ্রাফি) এক অসামান্য শিল্প হয়ে ওঠে। ভারতীয় কলমে দিল্লীর শাসকদের মধ্যে এ শিল্প অসাধারণত্ব লাভ করে। মুদ্রাশিল্প, ছোটো-ছোটো পদক বা সিল (মুহরের মুদ্রণ-চিহ্ন)—এগুলিও অসাধারণ সুন্দর। মীনার কাজও উপেক্ষণীয় নয়। সাজপোশাকের কথা বাদ দিলাম। ভারতবর্ষে ঐসলামিক গমনাগমন শুরু হয়, পূর্বে বলেছি, অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে। দশম খ্রীষ্টাব্দে আমরা পাই বিশ্বের সর্বপ্রথম ভারততাত্ত্বিক আলবিরুনিকে। তাঁর অসাধারণ ক্ষমতায় তিনি মূলতান অঞ্চলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন এবং ভারত ও তৎকালীন অবস্থা আর দর্শন সম্বন্ধে প্রামাণ্য পুস্তক রচনা করেন। ভারতবর্ষের মতো রক্ষণশীল দেশের বিজ্ঞান দর্শন ইতিপূর্বেই আরবীয়গণ গ্রহণ করে-ছিলেন। তা সত্ত্বেও ভারতে আগমন খুব নির্বিঘ্নে

হয় নি। বাইরের প্রতিরোধ শক্তি দিয়ে ভেঙে দেওয়া সম্ভব হলেও, ভিতরের প্রতিরোধ জয় করা খুবই সময়সাপেক্ষ হয়। তা সত্ত্বেও ধীরে-ধীরে উচ্চ-মধ্যবিত্ত তথা নিম্নমধ্যবিত্ত স্তরেও ইসলাম ধর্মের সূক্ষ্ম প্রভাব আচার-ব্যবহারে, ভাষাসাহিত্যে, এমনকী ধর্মেও (চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব মতে, সত্যনারায়ণের পূজায়) পরিব্যক্ত হতে থাকে। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে এই আলোচনা শেষ করতে চাই। ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলাম ধর্ম গৃহীত হবার মূলে সুফী মতবাদের অবদান যথেষ্ট। সুফীরা মুক্তমনা এক গায়েবি কুরান অনুসরণ করেন বলে বলেন। তাঁদের ধর্মাচরণ মরমিয়া আর অতীন্দ্রিয়-বাদের অনুশীলন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতের পশ্চিমে বা পূর্বে সর্বত্রই তাঁরা অপ্রতিহতগতি এবং পারস্পরিক লেনদেনের ভিত্তিতে তাঁদের ধর্মবিজয় অধিকতর সফলতা প্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে হয়। দশম খ্রীষ্টাব্দে পরিব্রাজক সুফী মনসুর বিন হাল্লাজ চীন হয়ে এদেশে আসেন—সম্ভবত তাঁর দর্শনে তিনি অন অল হক (অর্থাৎ আই অ্যাম ট্রুথ) কথাটি সংযুক্ত করেন। এজন্য শেষ পর্যন্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা হয়। আমাদের মনে হয়, এটি শঙ্করদর্শনের 'অহং ব্রহ্মাস্মি' কথাটির প্রভাবজাত। মনে রাখা দরকার: কিছু কাল পূর্বেই আলবিরুনি মহম্মদ তুঘলকের মুদ্রায় আল্লাহ্ শব্দের অর্থ ব্রহ্ম করেছিলেন। মুদ্রার একপাশে আরবি, অন্যপাশে নাগরী হরফে তা লেখা হয়। সুফী পরিব্রাজকদের যাতায়াতের সীমারেখা নির্দিষ্ট থাকত না—যেমন থাকত না এদেশের উদাসীদের। তাঁরাও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে চলাফেরা করতেন না।

ডীইজমের একটি সুপরিব্যক্ত পরিকল্পিত রূপে ইসলাম এখনও একটি বৈশ্বিক ধর্ম হিসাবে বর্তমান জগতে স্থায়িত্ব লাভ করেছে। একেশ্বরবাদের দূর-প্রসারী আদর্শ ইসলামধর্মাবলম্বীর দ্বারা দীর্ঘ কাল ধরে যুগযুগব্যাপী এক সাধনায় মানবজীবনকে সংগঠিত করেছে, এবং আজকের দিন পর্যন্ত সংগ্রথিত করে রেখেছে বললে ভুল হবে না। ইসলামি ডীইজমের প্রধান কথা শক্তিমত্তা, এবং সেই শক্তি দ্বারা অর্জিত ভোগরাগ। আজও তা অব্যাহত আছে, এবং স্বাভাবিক নিয়মেই নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতেও তার মূল সুর অবিকৃত আছে।

থীইজম

জুডাইস থেকে শুরু করলে দেখা যায়: ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ সলোমন আর রাজা ডেভিডের রাজত্বকাল। ৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ইসলাম-প্রবর্তক হজরত রসুলের আবির্ভাব। কিন্তু এই সময়টার মাঝখানে একেশ্বর-বাদের আরও একটি আশ্চর্য শাখা জুডাইজম থেকে নিঃসৃত হয়ে ধরাধামে বিস্তৃত হয়, এবং এখনও পর্যন্ত অবিসংবাদিভাবে সেটি বিশ্বের সবচেয়ে বেশি লোকের ধর্ম হিসাবে অনুসৃত এবং স্বীকৃত। জুডাইজম এবং ইসলাম—দুটিই ডীইজম; অর্থাৎ, দুই ক্ষেত্রেই পরমেশ্বর মহান এবং সুদূর। ভগবান আর ভক্তের মধ্যে ব্যবধান দুস্তরকল্প। প্রকৃতপক্ষে সেইটাই ডীইজমের চরম মর্মকথা। পরমেশ্বর ভয়ের পাত্র, এবং শক্তির উৎস। তিনি দণ্ডদাতা এবং পরিত্রাতা এক সেনাপতির মতো বিধানে তাঁর অনুচরদের পরিচালিত করেন। স্রষ্টা হিসেবে তিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর যোগ বহিরঙ্গ।

এই অবস্থায় ডীইজমের অন্তর থেকে উৎসৃজিত হয়েছে আরও একটি ধর্মমত—এটির নাম হল খ্রীষ্টান থীইজম। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে (চার্ট দ্রষ্টব্য) বা কাছাকাছি সময়ে বেতলেহেমে তাঁর জন্ম হয়। দরিদ্রসন্তান তিনি। পিতামাতা-সংক্রান্ত কিছু বাস্তব বিচ্যুতি আছে কিনা, আমরা তা ঠিক নির্ণয় করতে পারি না। তবে তাঁকে পবিত্র কুমারীর সন্তান বলা হয়। এ নিয়ে বহু তর্ক-বিতর্ক বিদ্যমান। খ্রীষ্টও

দৈবতসন্তান। তাঁর জীবনও রাজরোষ থেকে রক্ষা পায় দয়ালু মেষপালকদের দ্বারা। তিন পূর্বদেশজ প্রাজ্ঞ পুরুষ আকাশের তারা দেখে পথ চিনে এসে সেই শীতার্ত রাতে তাঁকে অভিনন্দন জানান। এই ঈশার জন্ম হয় এক পান্থশালায় পশুদের আশ্রয়-স্থানে। প্রাজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাঁকে উপহার দেন স্বর্ণ, তিক্ত কুন্দুরু আর গন্ধদ্রব্য। এ তিনটি তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের ঘটনাবলীর প্রতীকস্বরূপ। এই দৈবতসন্তান বা ঈশ্বরপুত্রের (মানবপুত্র বলাই ঠিক) জীবন স্বর্ণোপম মূল্যবান, তিক্তফলের মতো বেদনাদিগ্ধ এবং গন্ধ-দ্রব্যের মতো প্রসারিত তাঁর যশোরাশি বলে তাঁরা মনে করেন।

আমরা জানি না, কিভাবে এই শিশুর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণ হয়। (তাঁর আসল নাম বোধহয় ইসমাইল ছিল।) তিনি বারো বৎসর বয়সে প্যালেস্টাইনের জুইশ মন্দিরগৃহে নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করেন। তিনি অসমসাহসে তৎকালীন মন্দিরচত্বরে দেখা নানা কদাচার আর কু-অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকেন, এবং এইভাবে ক্রমশ প্রাচীনপন্থী সংস্কারাবদ্ধ পুরোহিতদের বিরাগভাজন হন। এরা তাঁর বরাবরের শত্রুরূপ হয়ে ওঠে। পরে এদেরই চক্রান্তে রোমক শাসকগণ তাঁর প্রাণনাশের আদেশ দেন। প্রাণ-নাশের ব্যবস্থা ছিল ক্রুশে বিদ্ধকরণ। এই কাহিনীটি নানাভাবে পরিবর্ধিত হয়ে দু হাজার বছর ধরে এখনও উদ্ভাসিত হয়ে চলেছে।

যুগ হিসাবে খ্রীষ্টপ্রবর্তিত ধর্মকে স্থাপন করা যায় ইসলামের ৬০০ বৎসর পূর্বে এবং জুডাইজম আর ইসলামের মাঝখানে। কিন্তু বিশিষ্টতা হিসাবে খ্রীষ্টধর্ম এক অনন্য সামগ্রিকতা অর্জন করে এবং পূর্বোক্ত দুটি ধর্ম থেকে পৃথক স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এই উত্তরণ একেবারেই মানবীয় এবং মাধুর্যময়। এই গুণ পূর্বোক্ত দুটি ডীইজমের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সেজন্য বিকাশ আর বিবর্তনের পথে যথাক্রমে দেখি—পলিথীইজম থেকে এসেছে মনোথীইজম—মনোথীইজমের প্রকারভেদের মধ্যে প্রথমেই দুই স্তরের ডীইজম। উত্তরণের পথে অবশেষে আমরা পাই থীইজম। বলতে গেলে, ধর্মীয় অনুশাসনের পথে এটিই স্থির আর স্থায়ী স্তর। ধর্মমত হিসাবে আর অন্য স্তরের আবির্ভাব হয় নি থীইজমের পরে। থীইজম তাই বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে, এবং এর পরে কোনো কিছু ভাবতে গেলে আসে একমাত্র এথীজম। এটিকে যদি বিজ্ঞানের দান বলে স্বীকার করি, তাহলে এর পর আলোচনা করলে আমরা বুঝব—থীইজমকে কেন্দ্র করে নানারকম যৌক্তিক দার্শনিক সমর্থনসহ কয়েকটি নাম আমরা পেতে পারি মাত্র। এগুলির কোনোটিই ধর্মীয় মত নয়। আরও একটি কথা মনে রাখা দরকার: থীইজম মুকুলিত বিকসিত পুষ্পিত হবার পথে সময়টা দীর্ঘকালব্যাপী ফিউডাল সমাজের পোষকতা লাভ করেছিল। সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি সহ এই সময়টা ধর্মীয় জীবনের একটা পূর্ণতার সময় বলা যায়। তৃতীয়-চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে সন্ত অগস্টাইন থেকে নিয়ে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সন্ত টমাস অ্যাকুইনাসের কাল পর্যন্ত এই এক হাজার বৎসর খ্রীষ্টধর্ম ব্যাপকভাবে পুষ্টি লাভ করেছে, মানবজীবনকে প্রেরণা দিয়েছে। ইসলাম ধর্মকেও রাজনৈতিক বলভরসার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখেছি। খ্রীষ্ট-ধর্মকে কেন্দ্র করেও রাজনৈতিক আন্দোলন-আলোড়ন চলে এসেছে। দুটি ধর্মই শাসকদের পরিপোষকতা কোনো-না-কোনো ভাবেই পেয়েছে। কিন্তু, দুটি ধর্মের পথ পৃথক, এবং দশম খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উভয়ের ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেডের ইতিহাস আমরা এখনও স্মরণ করি। সমগ্র ফিউডাল যুগের অবসান কল্পনা করা হয় ফরাসি বিপ্লবের প্রথম অধ্যায় বা বাস্তিলের পতনের সমাপ্তিতে। আর তারই সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের প্লাবনের শেষভাগে পুরোহিতত্ত্বেরও অবসান ঘটে যায়। এ সত্ত্বেও আজকের দিনে খ্রীষ্টধর্ম বিশ্বের প্রথম ধর্ম বলা যায়; ইসলাম দ্বিতীয় স্থানে—এ কথা আগেই

বলেছি। অবশ্যই এ গণনা বিশিষ্টতা বা শ্রেষ্ঠতার জন্য নয়—নিতান্তই লোকসংখ্যার হিসাবে ধরা।

এখন আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে আমরা প্রথমেই দেখি: ডীইজমের মতো স্রষ্টা আর সৃষ্টির মধ্যে কিংবা উপাস্য আর উপাসকের মধ্যে দূরত্ব নেই। এখানে পরমেশ্বর শুধু বিধাতৃকল্প নন, তিনি পিতৃ-কল্পও। ডীইজমের পরমেশ্বর নৈর্ব্যক্তিক এবং তটস্থ। থীইজমের পরমেশ্বর ব্যক্তিক বা পার্সোনাল, এবং তিনি ভালোবাসার পাত্রও বটে। পিতার মতো তিনি সর্বক্ষম এবং প্রতীক্ষাপরায়ণ। তাঁর কাছে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকৃত পাপতাপের খণ্ডন আছে। সেটা নির্ভর করে পাপীর অনুতাপ আর প্রায়শ্চিত্তের উপর, এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর ক্ষমা আর করুণার উপর। প্রতি মানুষ তাঁর নিকটবর্তী হতে পারে ধার্মিক এবং সন্নিকটতার সাধনায়। এই নিকটতা নির্ভর করে বাইরের আর ভিতরের নৈতিক শুচিতার উপর। শুধুমাত্র বহিরঙ্গ নিয়মনিষ্ঠা দিয়ে অভ্যাস দ্বারা তিনি লভ্য নন। এতে করে একটা কথা আমরা বুঝতে পারি: এটা হল মানবীয় জীবনে যেমন-যেমন বিকাশ বা ডেভেলপমেনট ঘটেছে, মানুষও তেমনই পূর্ণতির মানবতার দিকে এগিয়েছে, এবং স্বাভাবিক-ভাবেই চেতনার মধ্য দিয়ে পূর্ণতম আদর্শে ঈশ্বরকেও সৃষ্টি করেছে।

পূর্বোক্তভাবে ঈশ্বরকে কাছে এনে নিকটতম স্নেহশীল আত্মীয়ের রূপে দেখার প্রয়াস যীশুখ্রীষ্টই করেছিলেন বলে বলা হয়। দরিদ্র সূত্রধর পরিবারের একেবারে সাধারণ পিতামাতার ঘরে তাঁর জন্ম হলেও সে পিতামাতা সৎ গৃহস্থ ছিলেন। খ্রীষ্টকে ঈশ্বরপুত্র বলা হলেও জোসেফ-মরিয়মের আরও পুত্রকন্যা ছিল—এমন তথ্য বাইবেলের নিউ টেস্টামেনটে পাওয়া যায়। এখানে বলা প্রয়োজন যে, ভক্ত খ্রীষ্টমণ্ডলীর মতে ওল্ড টেস্টামেনটেই খ্রীষ্টের আবির্ভাবের কথা বলা আছে। নিউ টেস্টামেনট মূলত খ্রীষ্টভক্তদের এবং খ্রীষ্টের জুইশ নন এমন ইয়োরোপীয় ভক্ত সেনট্ পলের রচনা-আধারিত। অপরপক্ষে, একথাও মনে রাখতে হবে যে, প্রাচীনপন্থী জুইশ-ধর্মাবলম্বিগণ বাইবেলের প্রাচীন অংশ প্রামাণ্য বলে মানেন, এবং নিউ টেস্টামেনটকে সত্য তথ্যের ধারক বলে কোনো মর্যাদাই দেন না।

যৎসামান্যপরিমাণ এ ইতিহাসের কথা বাদ দিয়ে খ্রীষ্টান থীইজমের উপস্থাপনায় এলে পরে আমরা দেখি: এখানে পরমেশ্বর আর তাঁর সৃষ্টি যেন পরস্পরের প্রতিপূরক। খ্রীষ্টকে এক সম্প্রদায় ঈশ্বর-পুত্র বলেন, অন্য (প্রোটেস্ট্যানট) সম্প্রদায় তাঁকে মানবপুত্র বলেন। দার্শনিক বিচারে খ্রীষ্ট প্রচার করেন অপরিসীম প্রেম আর অপরিমেয় ক্ষমার মাহাত্ম্য। অসভ্য আর বর্বর স্তরের অজানিত এক মনুষ্যত্ববোধের যে উন্মেষ হয় সামন্ততান্ত্রিক যুগে, খ্রীষ্টই তার প্রাণপুরুষ বললে অসঙ্গত হয় না। তাঁর মতে, বিশ্বাস প্রত্যাশা প্রেম—এই তিনটি সত্যের উপলব্ধিই দিব্যজীবন। হিংসার হিংস্রতাকে তিনি প্রেমধর্মে আর সেবায় পরাভূত করার কথা বলেছেন। তাঁর জীবনে তিনিও নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলে জানতেন, কিন্তু ঐশী শক্তির দ্বারা নিজের ভবিতব্য বা নিয়তিকে খণ্ডন করতে চান নি। অসহায় দলিত হাজার-হাজার মানুষ তাঁর বাণী শুনে আশা আর আশ্বাস পেত। বারোটি শিষ্যকে তিনি স্বীয় পরিকার হিসাবে গ্রহণ করেন। এদেরই মধ্যে একজন (জুডাস) ত্রিশ মুদ্রার বিনিময়ে তাঁকে শত্রুদের কাছে ধরিয়ে দেয়। তাঁর অপর এক শিষ্য সন্ত পিটর (পরবর্তী কালে) আত্মগত্য ভুলে তাঁকে অস্বীকার করেন। খ্রীষ্ট আশ্চর্য মনোবল দিয়ে এই বেদনা আর অপমান বহন করেন। সবচাইতে বড়ো কথা—তিনি এদের ক্ষমা করেন।

খ্রীষ্টের একটা বিচারের প্রহসন হয়েছিল। উদ্যোক্তা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা জুইশ সম্প্রদায়ের পুরোহিতবর্গ। খ্রীষ্টের জনপ্রিয়তা দেখে তাঁরা শঙ্কিত হয়েছিলেন। তাঁদের প্ররোচনাতেই জুডিয়ার

তৎকালীন রোমীয় শাসক তাঁর বিচার করেন। বিচারে তিনি দোষের কিছু পান নি। অথচ নির্দোষকে তাঁর সাজা দিতে হল শুধু এই ধার্মিকতার মুখোস-পরা গোঁড়া পুরোহিতদের জন্যই। তিনি হাত ধুয়ে ফেলেন। অর্থাৎ, প্রতীকী রূপে নিজের দোষ ক্ষালন করেন। নির্যাতিত মানবপুত্র লাঞ্ছনা-অপমানের মধ্যে নীরবে নিজের ক্রস বহন করে বধ্য-ভূমিতে উপস্থিত হন।

তাঁর মৃত্যুর দিন শুক্রবার ধরা হয়। অসহ্য যন্ত্রণায় আর্ত খ্রীষ্ট উচ্চারণ করেন: 'পিতা, তুমি কি আমায় পরিত্যাগ করেছ?' অনুমান হয়, বিকালের দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। বলা হয়, পর দিন তাঁর শিষ্য, মাতা ও ভক্ত মহিলা মেরি ম্যাগডালেন তাঁকে সমাহিত করেন। মরণের আগে তিনি আবারও প্রার্থনা করেন: 'পিতা, এরা কী করছে তা জানে না, তুমি এদের ক্ষমা করো।' বলা হয়, মৃত্যুর পর তৃতীয় দিনে (সোমবারে) তাঁর পুনরুত্থান হয়। মৃতদেহও পাওয়া যায় নি। এর মধ্য থেকে প্রতীকী কল্পনা হিসাবে আমরা পুনরুত্থানকে তাঁর উপলব্ধির অমরতা বলে ধরতে পারি কিনা পাঠক বিচার করে দেখবেন।

খ্রীষ্ট নামটির অর্থ অভিষিক্ত অথবা চিহ্নিত। তিনি জন দ্য ব্যাপটিস্টের দ্বারা অভিষিক্ত হন।

খ্রীষ্টের শিক্ষাধারার সঙ্গে বৌদ্ধমতের অনেকখানি মিল আছে। একটি থিয়োরি আছে যে, খ্রীষ্ট দীর্ঘকাল স্বদেশে ছিলেন না—তিনি হাঁটা পথে ভারতে এসে-ছিলেন। এটা তাঁর "মৃত্যুর" পরই হওয়া সম্ভব। হয়তো মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর দেহ পাওয়া গিয়েছিল এবং সেবাযত্নের পর তাঁকে হাঁটা-পথে পূর্বদেশের (বলা হয় কাশ্মীরের কোনো স্থানে—লেহ বা লাদাখের সন্তাগারে) কোনো আশ্রয়ে রাখা হয়। (এ বিষয়ে দ্রষ্টব্য রুশ লেখক নোটোভিচের বই *Unknown Life of Jesus Christ*।) খ্রীষ্টের তথাকথিত মৃত্যুর পর তাঁর জুইশ ভক্তমণ্ডলীর ভার গ্রহণ করেন তাঁর ভ্রাতা জেমস, পরে সন্ত পিটার। তারও পরে খ্রীষ্টানদের উপর রোমানদের অসহ্য রকমের অত্যাচার চলে। পরিশেষে, অত্যাচারীদের একজনা—পল—হৃদয়পরিবর্তন করার ফলে সন্ত পল হয়ে ওঠেন। রোম তখন খ্রীষ্টধর্মের নবজাগ্রত মন্দির (ভ্যাটিকান) বলে স্বীকৃত হয়। এই দুই আদি সম্প্রদায় থেকে নানা সম্প্রদায় এবং বিরোধী (প্রোটেস্ট্যানট) সম্প্রদায় গড়ে ওঠে! এসব ইতিহাস যাই হোক, খ্রীষ্টধর্মের মূলসূত্র হল প্রেমধর্ম ও মানবসেবা।

খ্রীষ্টধর্মের একটি প্রধান কথা হল পাপপুণ্যের স্বীকৃতি। মানুষের ত্রুটিবিচ্যুতিস্খলনপতনকে খ্রীষ্টধর্ম সত্য বলেই মানে, এবং অনুতাপ আর আত্মশুদ্ধির বিধান তাঁদের সবচেয়ে বড়ো আশ্বাস। ধর্মের উপলব্ধির দিক থেকে, মানবীয় স্থিতির দিক থেকে খ্রীষ্টান থীইজম এখন পর্যন্ত অত্যন্ত বিচারসহ একটি ধর্মমত। এর মধ্যে যুক্তি আছে, ভক্তি আছে, এবং সাধনালভ্য মুক্তির আশ্বাস আছে। প্রতীকী মতে দার্শনিক বিচারে বলা যায়—স্রষ্টা আর সৃষ্টি যথাক্রমে পরমেশ্বর আর পরমেশ্বরের পুত্র—তিনি মানবপুত্রও বটে। আর এ দুটিতে স্পর্শ করে আছে পবিত্র আত্মা বা মানবচেতনা। অনেকের বিচারে, খ্রীষ্টধর্ম বহু ধর্মমতের ভিতর দিয়ে উঠে এসেছে ধর্মমতের এক বিশিষ্ট বিকশিত রূপ আর চেতনা নিয়ে। এটিকে একটি সুগঠিত সুসংস্কৃত সহজগ্রাহ্য পরম-উপলব্ধি-গোচর মানবীয় ধর্ম বলে ধরা যায়। ব্যক্তিগত বিচারে বর্তমান প্রবন্ধকারেরও তা মনে হয় (চার্ট ৩ দ্রষ্টব্য)।

পরিশেষে, খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে শেষ কথা বলা যায় না। ইসলামের মতো, জুডাইজমের মতো, খ্রীষ্টধর্ম জীবিত ধর্ম। দীর্ঘ দু হাজার ধরে এ ধর্ম মানবসভ্যতা-সংস্কৃতির, সাহিত্য-শিল্পের পরিপোষকতা করে এসেছে। জননী মেরির জীবন, খ্রীষ্টের আত্মদান, সংঘপ্রতিষ্ঠা—এগুলি নানাভাবে মানুষের কল্পনাকে আশ্বাস দিয়েছে, অস্তিত্বে স্নিগ্ধতা এনে দিয়েছে। অপর দিকে, এই রাজধর্মকে আশ্রয় করে ক্ষমতালোভী শাসক আর পুরোহিতদের লড়াই কোথাও পরাজিত করেছে পুরোহিতদের (টমাস বেকেট), কোথাও-বা জয়লাভ হয়েছে পুরোহিততন্ত্রের (ক্যাথলিক চার্চ)। ক্যাথলিক-কেলভিনিস্টের লড়াই, ক্যাথলিক আর ওল্ড রুশ চার্চের লড়াই হিংস্রতায় পূর্বানুষ্ঠিত ক্রুসেড অপেক্ষা কম নয়। এর সঙ্গে-সঙ্গে গড়ে উঠেছে অপরূপ শিল্পসম্ভার। তুর্ক-বাইজেনটাইন রীতিতে তৈরি অপরূপ নীল-ও স্বর্ণবর্ণালঙ্কৃত ডোমযুক্ত চার্চ, গথিক-চূড়া-সমন্বিত চার্চ ইয়োরোপের দেশে-দেশে দেখা যাবে। এসব চার্চের আভ্যন্তরীণ সজ্জালঙ্কার অস্তিত্বকে একপ্রকার সৌন্দর্যানুভূতিতে সম্মোহিত করে। আলোড়িত করে বাখের সঙ্গীতের আশ্চর্য সুরলহরী। এই খ্রীষ্টধর্মের উন্মোচিত হয়েছে এক অপরূপ শিল্পসঙ্গীতের ঐশ্বর্য যা এক ধরনের মাটির পৃথিবীতে আনীত স্বর্গসমতুল্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবনব্যাপী কৃচ্ছ্রসাধনা আর তপস্যা, এবং মানবীয়-বেদনাশ্রুসিক্ত বোধানুভূতি, এবং বহু ক্ষেত্রেই নিজের সত্তাকে ঈশ্বরকল্প খ্রীষ্টভাবনার কাছে নিবেদন করে দেওয়া। এমন কথা বলা যায় না যে এই মর্মসাধনা সর্বত্রই ঐকান্তিক এবং একই ভাবে চলে আসছে। ভালোমন্দের ব্যতিক্রম যাই থাক, খ্রীষ্টানুসারী এই সেবাব্রতের দ্বারা লক্ষ-লক্ষ দুঃস্থ অনাথ বুভুক্ষু নরনারী আর রোগী মানুষ একটি স্বস্তি পেয়েছে। খ্রীষ্টধর্মানুশাসনের মধ্যে বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হয় পাপ বা সিন বা কমিশনের উপর, এবং স্বীকৃতির উপর। বর্তমান গবেষকদের অনেকে মনে করেন—বহু প্রাচীন কাল থেকে জুইশ এসিস সম্প্রদায়, খ্রীষ্টমণ্ডলী আর সঙ্ঘব্যবস্থা এবং সুফী সাধকদের মধ্যে পরোক্ষ হলেও কিছু বৌদ্ধ প্রভাব থাকা সম্ভব। ক্যাথলিক ক্যানন আর বৌদ্ধ বিনয়ের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

সংগ্রহণ—বিবিধ (যা চার্টে নেই)

নাস্তিক্যবাদ: নানাদিক ভেবে মনে হয়েছে: ধর্মের অভ্যুদয় এবং ইতিহাস শেষাবধি একটা দার্শনিক লক্ষ্যে এসে পৌঁছেচে। সংগঠিত, সুসম্বদ্ধ ধর্মমতগুলির আলোচনা আমরা করে এসেছি। ধর্মমত-গুলির প্রধান কথাই হল—একটি আস্তিক্যবাদ বা ঈশ্বর আছেন। এই ভিত্তিমূল থেকেই নানা দিকে প্রসারিত হয়েছে বহুদেববাদ, দ্বিদেববাদ বা একদেব-বাদ। প্রতিষ্ঠিত যুক্তি দিয়ে দেশে-দেশে এই আস্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপর দিকে দেখা যাবে, কোনো-কোনো দেশে সেই যুক্তিবাদের পরিশীলনেই দেখা দিয়েছে অনস্তিত্ববাদ বা নাস্তিক্যবাদ। আশ্চর্য হতে হয় এটা দেখে যে, এই অনস্তিত্ববাদ সর্বত্র সমভাবে বিকশিত হতে পারে নি। আবার, যেখানে তা হয়েছে সেখানে অস্তিবাদী ধর্মের পাশাপাশিই এরকম অনস্তিত্ববাদ গড়ে উঠেছে। কোথাও তা ধর্মভাবাপন্ন নীতিমূলক হয়ে উঠেছে। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তা দর্শনমূলক এমনকী, দেখা যাবে, ভারতীয় বৈদিক ধর্মের পাশাপাশি বর্তমান অবৈদিক চার্বাক-দর্শনের ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রতিপাদন। এটি মনে হয় সুপ্রাচীন গ্রীক থিঙ্কিঙের উদাহরণ। বৈদিক জীবনে দুটিই ছিল বলে অনুমান করা যায়। চতুর্থ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সক্রেটিস-প্রবর্তিত ডায়ালেকটিক্যাল যুক্তিবাদও ওই ঈশ্বরবাদের খণ্ডন। গ্রীসে সে সময় বহুদেববাদ তো প্রচলিত ধর্ম হিসাবে বর্তমান ছিলই, এবং সক্রেটিসকে তাঁর মতবাদের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করতে হয়। এই দুটি ধর্মমত নয় ঠিকই।

কিন্তু অনস্তিত্ব- অনীশ্বর-বাদী ধর্মমত কাছাকাছি সময়েই ভারতে আর চীনে আবির্ভূত হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ সালে ভারতে বুদ্ধ আবির্ভূত হন। তাঁর সময় অন্তত ছয়টি প্রধান নাস্তিক্যবাদ প্রচলিত ছিল। এসকল মতবাদী সঙ্ঘ আর সঙ্ঘগুরুরও কথা আমরা জানতে পারি। গৌতম বুদ্ধ এর মধ্যেই নিজের মধ্যমাপ্রতিপদ বা যুক্তিবাদী এক অনস্তিত্ববাদী ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁর ত্রিনীতি হল অনিত্যতা-বাদ, অনাত্মবাদ, অনীশ্বরতাবাদ। অনিত্যতা বা ইমপার্মানেন্স বর্তমান বিজ্ঞানসাধনার মূলকথা।

অনাত্মতা মানে কোনো স্থায়ী সত্তা নেই, এবং তৃতীয়টির অর্থ হল: এই সচল জগদ্‌ব্যাপারের কোনো ঈশ্বরকারণতার যুক্তি নেই। অথচ, সমগ্র বৌদ্ধধর্ম অনস্তিত্ববাদী হলেও পৃথিবীর তৃতীয় প্রধান ধর্ম বলে স্বীকৃত। এটিকে নৈতিক ধর্ম বা এথিক্যাল ধর্ম বলা হয়; সাধারণ্যে যে সততা, মানবিকতা আর সদ্‌গুণের বিকাশ দীর্ঘকাল ধরে ঘটেছে, সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধ-ধর্ম তার উপর নির্ভরশীল। এখানে নৈতিক বিকাশের উপর মুক্তির কথা ভাবা হয়, এবং প্রতিপাদ্য বহু নিয়মশৃঙ্খলার আধার হিসাবে সঙ্ঘ বা মণ্ডলী স্বীকৃত। প্রকৃতপক্ষে, বৈদিক-পৌরাণিক যুগে বানপ্রস্থ ছিল; গৃহস্থ কুলপতি আর ঋষিদের আশ্রম ছিল বোঝা যায়। কিন্তু সঙ্ঘ বা সন্ন্যাস-আশ্রমের পরিকল্পনা, মনে করা হয়, গৌতম বুদ্ধের। সমসাময়িক কিছু আশ্রমিক সঙ্ঘকল্প অনীশ্বরবাদী সাধকও ছিলেন বলে আমরা প্রমাণ পাই। গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্ম আর দর্শন নব্য ধারায় প্রচলিত হয়ে এখনও পর্যন্ত বিশ্বধর্ম হিসাবে বিদ্যমান। বৈদিক ধর্মের পাশাপাশি থেকেই তাঁর ধর্ম বৈদিক ধর্ম আর যজ্ঞানুষ্ঠানের বিরোধী। এ ধর্মও রাজানুকূল্য পেয়ে ভারতের বাইরে প্রসারিত হয়—পশ্চিমে এশিয়া মাইনর হয়ে চলে যায় আবিসিনিয়া পর্যন্ত, আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত। পূর্বে তা প্রচারিত হয় দক্ষিণ ভারত, লঙ্কাদ্বীপ, আর তার পরে প্রশান্তমহাসাগরপারে ইন্দোনেশিয়া-মালয়-ভিয়েতনামে আর কোরিয়ায়। নিজের দেশে ক্রমে তা আনুকূল্য হারিয়ে, উত্তরাপথ বয়ে নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া হয়ে চীন, জাপান পর্যন্ত চলে যায়। নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে (হয়তো আজ বুদ্ধও তা চিনতে পারবেন না) সজীব ধর্ম হিসাবে চলে আসছে। সাধারণভাবে মনে হয়, উত্তরাপথের ধর্মমতগুলি মহাযান বা পরের দিকের মত, এবং দক্ষিণাপথের মতগুলিকে তাঁরাই হীনযান আখ্যা দেন। বস্তুত, দক্ষিণাপথের মতগুলিই প্রাচীনতর স্থবিরবাদ। তাঁরা বুদ্ধানুশাসন বলে মনে করেন—মানুষ সাধনার দ্বারা অর্হৎ হতে পারে, বুদ্ধ হতে পারে না। মহাযানীরা সম্যক্‌সম্বোধিযান বা প্রত্যেকবুদ্ধযান মানেন। অর্থাৎ, প্রতি মানুষই স্বকর্মসাধনায় বুদ্ধপ্রতিম হবার সম্ভাবনাময়। বৌদ্ধমত এখনও জীবন্ত এবং বহুজনগ্রাহ্য বলে আধুনিক জগতে সমাদৃত।

খ্রীষ্টধর্ম বা ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয় বৌদ্ধধর্মের পরে হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের আনুকূল্যে আমরা পেয়েছি বিশাল সাহিত্য—সংস্কৃত আর পালিতে লেখা। অনেক লেখাই চীনা, তিব্বতী, মাঙ্গোলীয় ভাষায় অনূদিত হয়। বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম, সুন্দর মন্দির আর চৈত্য, স্তূপ আর স্তম্ভ, খচিত বুদ্ধবাণী (অশোকের সময় থেকে) তার ধর্মবিজয়-অভিযান সূচিত করে।

এইভাবে বৌদ্ধধর্ম ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শুরু হয়ে ন্যূনাধিক হাজার বৎসরের পরিক্রমাপথে সমৃদ্ধতর পূর্ণতর হতে থাকে। নানাবিধ রূপান্তর হলেও তার মূল লক্ষ্যে এখনও ইতরবিশেষ হয় নি। বৌদ্ধধর্ম মানুষকে আশ্বস্ত করে নিজেকে জাগ্রত করতে, এগিয়ে যেতে সাহস দেয়। এখানে ঈশ্বরকারণতাও নেই, জাতিভেদও নেই। বৌদ্ধেরা সংসারত্যাগী আর সংসারী বিধায় যথাক্রমে ভিক্ষু আর উপাসক হিসাবে স্বীকৃত (সম্রাট অশোক আর হর্ষবর্ধন দুজনেই উপাসক ছিলেন)। উত্তর ভারতে রাজানুকূল্য হারাবার সঙ্গে-সঙ্গে ভারতে তথাকথিত হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে ক্রমে অভিভূত এবং বিতাড়িত করে। ভারতের বাইরে থেকে নবজাগ্রত বৌদ্ধমতকে ইয়োরোপীয় বিদ্বানেরা আর তাঁদের সাথে-সাথে এদেশীয় যুক্তিবাদীরা, পণ্ডিত-সজ্জনেরা বৌদ্ধমতের আলোচনায় তৎপর হন। এ সত্ত্বেও প্রকৃত কথা হল, একমাত্র চট্টগ্রাম আর অসম অঞ্চল ব্যতীত ভারত-বাংলাদেশ অঞ্চলে বৌদ্ধ জন নেই বলাই সঙ্গত। হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে শুধু পর্যুদস্ত করে বা তাকে বিতাড়িত করে ক্ষান্ত হয় নি। তার হাতে নিগৃহীত বৌদ্ধধর্ম আর বৌদ্ধধর্মের প্রধান-প্রধান স্থানগুলি ক্রমশ ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দশম খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একেবারে পরিবর্তিত হয়ে প্রায়-হিন্দু রূপ লাভ করে।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে, এক সময়ের বৌদ্ধ তীর্থ-গুলিতে (যেমন, মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, কাশ্মীর অঞ্চলে) যথাক্রমে বৈষ্ণব, শৈব আর সৌর উপাসনার প্রভাব বাড়তে লাগল। মন্দিরগুলিও মঠের উপর গড়া হল। জগন্নাথমন্দির, রঙ্গনাথের আর বিঠ্‌ঠলের মন্দির এইভাবেই গড়ে উঠেছে। অপর দিকে, বুদ্ধ-মূর্তিগুলি শিল্পের মহৎ আদর্শ হিসাবে অপার প্রজ্ঞা আর করুণার বাণীর মূর্ত রূপ হয়ে কোথাও বিরাজিত। কিন্তু অনেক বুদ্ধমূর্তিকেই কোথাও বিষ্ণু, কোথাও ধ্যানী শিব, আবার কোথাও সূর্য বলে পূজা করা হচ্ছে। রাজগীর, বুদ্ধগয়া প্রভৃতি বুদ্ধনামাঙ্কিত স্থান-গুলিকে সতত হিন্দুতীর্থে পরিণত করার প্রয়াস দৃশ্যমান। প্রাচীন বুদ্ধগয়ার মন্দিরটি শৈবদের কবলিত ছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এটিকে পুনর্নির্মিত তথা পুনর্ধ্যবসিত করেন।

নাস্তিকচার্বাকমত: বৌদ্ধ-জৈনদের মতো চার্বাকমতও একপ্রকার নাস্তিক্যবাদ, এবং প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধ নাস্তিক্যবাদ। ধর্মের ইতিহাসে বৈপরীত্য হিসাবেই চার্বাকমতটার উল্লেখ করতে হল। মনে হয়, সর্বদেশে-কালে ধর্মভাবনার সঙ্গে একপ্রকার স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র মতবাদ গড়ে উঠতে পারে। চার্বাকমতকে সেইভাবেই দেখা দরকার। এ নিয়ে এত আলোচনা না করে শুধুমাত্র সংক্ষেপে তাঁদের মতবাদ উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ করি।

চার্বাকমত সম্পূর্ণভাবে ভৌতদর্শন বা মেটিরিয়া-লিজম। এ মতে চৈতন্যও বস্তু থেকে আসে। বলা যায়, ভারতীয় সব কটি দর্শন আর ধর্মমত একযোগে চার্বাকমতের বিরোধী। এঁদের শাস্ত্রাদি প্রায় দুর্লভ। তবু মনে করা যায় যে, এ-প্রকার যুক্তির আধার মানবমননের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টি।

চার্বাকদের পরিচয় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে সুপ্রকাশিত:

'স্বর্গ নেই, অন্য জন্ম নেই, নরকও নেই; ধর্মাধর্ম (কর্মফল) নেই; এই সচল জগতের কর্তা ভর্তা হর্তা কেউ নেই; কারণ প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোনো প্রমাণ বা জ্ঞানসাধন এবং এগুলির প্রত্যক্ষ হয় না; তেমনই দেহ ভিন্ন আত্মার (অপ্রত্যক্ষ বলে), অস্তিত্ব নেই। এই মিথ্যাগুলি লোকে অনুভব করে বলে থাকে—এটা তাদের মূঢ়তাবশত করে, বুদ্ধিভ্রংশ হলে লোকে সত্য আর মিথ্যার প্রভেদ করে না।'

চার্বাকমত এখানে উল্লেখ করা হল প্রাচীন এক ধর্মমতের বিপরীত মত বলে। ধর্মের ইতিহাসে এরও বিশিষ্ট স্থান অনস্বীকার্য। এই যুক্তি-আধারিত মতবাদকে একযোগে ভারতের সব ধর্ম আক্রমণ করেছে। মনে হয়, অন্য দেশেও তাই। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর সক্রেটিসের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

সার্বকালিক ধর্মবোধের উদ্ভাবনায় যে-যে মনন-ক্রিয়া থাকে, তার বর্ণনা আমরা আগেই করে এসেছি। আমরা বিস্মৃত হতে পারি না—তারই পাশাপাশি একটা যুক্তিসিদ্ধান্তও কতক মানুষের মনে গড়ে ওঠে। চার্বাক-নাস্তিক্যবাদ একেবারে এক স্বতন্ত্র যুক্তিবাদ। পরের দিকে এরূপ যুক্তিবাদ সকল দেশের ধর্মবোধের পাশাপাশি উপস্থাপিত হতে পারে সেটা আমরা পরে দেখতে পাব।

তাওইজম্ / কনফিউশিয়নিজম: মানব-মনে ধর্মের যুক্তি বা যুক্তি-আশ্রিত একপ্রকার ধর্মমত হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। যে কারণেই হোক, বৌদ্ধমত, তাওইজম আর কনফিউশিয়নিজম পারস্পরিক নৈকট্যবন্ধনে আবদ্ধ মনে হয়। তবে এরা প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে এক নূতন মার্গপ্রদর্শক। বৌদ্ধদের কথা বাদ দিলে, চীনের এ দুটি নীতিধর্মবাদও মানবজাতির এক বিশিষ্ট সম্পদ।

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছে—খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের তাওইজম, ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বৌদ্ধমত আর চতুর্থ-পঞ্চম খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কনফিউশিয়নিজম—তিনটি মতবাদই যুক্তি আর নীতির ভিত্তিতে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছে, এবং তিনটির উদ্ভাবক সমাজই কোনো-না-কোনো প্রকার মোঙ্গলয়েড নৃকুলের লোক। গৌতম

বুদ্ধওনেপাল-তরাই অঞ্চলের পার্বত্য ক্ষত্রিয় অধিবাসী। তাঁকে পরবর্তী কালে জোর করে হিন্দু অবতার বানানো হয়েছে। কিন্তু তাঁর প্রচারিত দেশনা আর ধর্ম মোঙ্গলয়েড-নুকুল-অধ্যুষিত দেশগুলিতে স্বীকৃত হয়েছে—এটা মনে রাখতেই হয়।

তাওইজমের প্রধান গ্রন্থ "তাও তে কিঙ" (অনুবাদ পাওয়া যায়) এক আশ্চর্য শিক্ষা- ও আচারশাস্ত্র-গ্রন্থ। তবে তা শুধুমাত্র আচারসর্বস্ব নয়। তাতে শ্লোকবদ্ধ রূপে অপরূপ কবিত্ব আছে, আর তার সাথে আছে এক অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ঝলকও। এইরূপ অনুভূতির জন্য "তাও তে কিঙ" গ্রন্থকে ভারতীয় উপনিষদ বা সুফী সাহিত্যের অনুরূপ বলে মনে হয়। "তাও" বা "ধাও" কথাটির অর্থ (আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে) পথ—যে পথ মানুষকে মানবিকতার পথে নিয়ে যায়। দেবতার কথা প্রায় নেই। যেটুকু আছে তা একাত্ম হয়ে আছে যেন আত্ম-সাক্ষাৎকারে অথবা আত্ম-উন্মোচন দ্বারা আত্ম-প্রসারণে। যে সময়ের কথা বলছি, তখন চীনদেশে রাজতন্ত্র আর সামন্ততন্ত্র যুক্ত হয়ে আছে; বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা-সহ মিশ্রিত হয়ে আছে অনাচার, অত্যাচার। এর মাঝে আবির্ভূত হয় এই মহাপথ "তাও"; এটি ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে সর্বজনের অনুসরণ করার মতো পথ, এবং পথের শেষে আশা আছে আত্মোত্তরণের। বস্তুত, এ ধরনের ধর্মসাহিত্য বা মর্ম-সাহিত্য, আমরা মনে করি, চীনেই গড়ে উঠতে পারত। এ শুধু অতীন্দ্রিয়বাদ নয়, সুফী মরমিয়াবাদ বা অধ্যাত্মবাদ নয়। এর আসল ভিত্তি হল কর্ম এবং আচার দ্বারা এগিয়ে যাওয়া। যন্ত্রণার মধ্যেও নিজেকে অতিক্রম করা যায়—এমন শ্লোকও আছে।

বলা হয়, দশম খ্রীষ্টাব্দে পরিব্রাজক সুফী সাধক মনসুর বিন হাল্লাজ চীনেও গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আনীত একটি শ্লোক পাওয়া যায়; এর নির্গলিত অর্থ হল—আমি (মানবাত্মা) যেন সেই পরমাত্মার সঙ্গে একত্র বিষপান করেছি—তিনি নির্বাচিত জনকে একপাত্রে সেই জীবনযন্ত্রণার বিষ পান করান। অনুরূপ রহস্যময় সূক্ত ঋগ্বেদেও একটি স্থানে মিলে যায়।

কনফিউশিয়িনিজম: লক্ষ করলে দেখা যায়, গ্রীসে প্রাপ্ত সক্রেটিসের শিক্ষা, ভারতে বৌদ্ধনীতি-ভিত্তিক ধর্ম এবং চীনে চতুর্থ বা পঞ্চম খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উদ্ভূত কনফিউশিয়নিজম—এগুলির মধ্যে একটাই মানবমননসূত্র বর্তমান। সক্রেটিসের মত অবশ্য ধর্মমত না হলেও আচরণীয় তো বটেই। বৌদ্ধমত এবং কনফিউশিয়নিজমকে একপ্রকার বাস্তববাদ আর ব্যবহারিক দৃষ্টির উপর আধারিত মানবধর্ম বললে অসঙ্গত হবে না। তাও মতের পটভূমিতে কনফিউশিয়-নিজমের প্রতিস্থাপনা করলে বোঝা যায়—প্রাচীনতর তাও-মত যেন ক্ষণে-ক্ষণে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতার ঝলক পেয়ে দীপ্তিমান। অপর পক্ষে, কনফিউশিয়-নিজম বেশির ভাগই শিক্ষিতমনস্ক মানুষের গ্রহণযোগ্য একপ্রকার মানবীয় নীতিধর্ম। এটি সুপরিকল্পিত, সুপরিশীলিত পরিণত চিন্তার পরিচায়কও বটে। বহু-দেবপূজক চীন সাম্রাজ্য একই সঙ্গে বৌদ্ধমতকে গ্রহণ করেছে অবশ্য আরও অনেক পরে—সপ্তম বা অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে। তত দিনে চীনের শিক্ষিত মানুষের মনোভূমি নূতন করে সৃষ্টি করেছে কনফুশিয়স-প্রবর্তিত এই নবীন যুক্তিসহ মানবিকতাবাদ। এটি রাজাপ্রজা তথা উচ্চবর্গীয় মধ্যবর্গীয়দের মধ্যে আচার-পরায়ণতা এবং ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার সহায়ক তত্ত্ব-মীমাংসাও বটে। [ক্রমশ

"অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা" অনিবার্য কারণে বর্তমান সংখ্যা থেকে ছাপা হচ্ছে সংক্ষেপিত আকারে। যে সব জিজ্ঞাসু পাঠকের প্রত্যাশা সংক্ষেপণের কারণে সম্যকভাবে পূর্ণ হবে না, তাঁদের অপেক্ষা করতে হবে রচনাটির পুস্তকাকারে প্রকাশ পর্যন্ত। সুধী পাঠকদের মার্জনা প্রার্থনীয়।—সম্পাদক।

ভক্তিমিশ্রিত ব্যাখ্যার শ্রদ্ধাঞ্জলি

আজহারউদ্দীন খান্

জনপ্রিয় লেখক কিংবা ক্লাসিক পর্যায়ের লেখক সম্পর্কে কতকগুলো বক্তব্য অধিকাংশ পাঠকই স্বতঃ-সিদ্ধরূপে গ্রহণ করে থাকেন। এই ধারণা ভাঙা সহজ হয় না। স্কুল-কলেজে থাকার সময় শিক্ষক আর অধ্যাপকরা পরীক্ষা-উপযোগী যে কথাগুলি বলেন সেটুকুই তাঁদের মনে গাঁথা হয়ে যায়। ফলে সেই ধারণা থেকে তাঁরা সহজে মুক্ত হতে পারেন না। যুক্তিগ্রাহ্য নতুন কিছু বললেও তাঁরা সহজে গ্রহণ করতে চান না। জগতে আজ পর্যন্ত এমন কোনো লেখা রচিত হয় নি যাকে নিখুঁত বলা যায়। স্বয়ং ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যেও খুঁত থাকে। সূক্ষ্মতম চুলেরও ছায়া পড়ে। কাজেই, লেখকদের সৃষ্টির মধ্যে কিছু না কিছু ত্রুটি থেকেই যায়। একথা বড়ো-ছোটো সবধরনের লেখক-দের সম্পর্কেই বলা চলে। অথচ পাঠকদের যাঁরা প্রিয় হন তাঁরাও যে রক্তমাংসের মানুষ, তাঁদের সৃষ্টির মধ্যে নানা বৈপরীত্য অসঙ্গতি থাকতে পারে, একথা পাঠকরূপে অনেকের পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বঙ্কিমের কথাই বলতে পারি।

বঙ্কিম আমাদের সাহিত্যে বিতর্কিত লেখক হলেও সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন তাঁর হাত দিয়েই হয়েছিল। তাঁর যে সময়ে আবির্ভাব হয়েছিল, সে সময় তাঁর প্রয়োজন ছিল। ইংরেজি শিক্ষা আর সভ্যতার আকস্মিক আলোয় দেশের যুবশক্তির চোখ ঝলসে উঠেছিল। ফলে, দেশের সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি—সর্ব বিষয়ের প্রতি তাদের একটি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য অশ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠেছিল। দেশের যুবশক্তিকে বিভ্রান্তির পথ থেকে নিজস্ব ধর্ম আর সংস্কৃতির দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য বঙ্কিমের লেখনীর সেদিন প্রয়োজন ছিল, এবং অসাধারণ সাফল্যও তিনি অর্জন করেছিলেন; জাতীয়তাবোধের উদ্বোধনও তিনিই করেছিলেন। এই প্রয়োজনেই তিনি বাঙলাদেশের ইতিহাস লেখার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। বাঙলা-দেশের ইতিহাস সেদিন যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়ায়, বাঙলার ইতিহাস রচনার দাবি তিনি তুলেছিলেন। ইতিহাস রচনা করার পরিশ্রম আর অধ্যবসায় তাঁর ছিল না বলে নিজের মতো করে ইতিহাস তৈরি করে নিয়ে জনপ্রিয় আদর্শে উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। কিন্তু তার মুখে উদ্দেশ্যের একটা শক্ত লাগাম পরিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে, শিল্প হিসেবে সব উপন্যাস রসোত্তীর্ণ হয় নি। নন্দগোপাল সেনগুপ্ত বলেছেন, 'বর্ণাশ্রমকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তিনি মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক গতিকে প্রতিহত করেছেন পদে পদে।...সামাজিক উপন্যাসেও বঙ্কিম প্রধানত নজর রেখেছিলেন সমাজ-গঠনের দিকে, রসসৃষ্টির দিকে নয়।...হিন্দু ও মুসলমানে, উন্নত ও অনুন্নতে, ধনী ও দরিদ্রে একটি স্থায়ী ও অনড় বিভেদের গণ্ডী টেনে দিয়ে, তিনি কেবল সম্পন্ন বর্ণ-হিন্দুর সংহতি ও পুষ্টিকেই দেশাত্মবোধ নামে প্রচার করে গেছেন।' ("বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা" ১৯৪০ সং, পৃ. ২৩৩-২৩১) আর প্রবন্ধও যা লিখেছিলেন তার মধ্যে কিছুটা নিজস্ব মত প্রচার ও তত্ত্ববিচার ছিল এবং আবেদন কিছু-কিছু তৎকালীন প্রয়োজনীয়তাকে

বঙ্কিম-সন্ধিৎসা—দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ। পরিবেশক: পুথিপত্র, ৯ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯। জুন ১৯৮৯। পঁয়ত্রিশ টাকা।

বঙ্কিম-সমীক্ষা—অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩। সেপ্টেমবর, ১৯৮৯। পঞ্চাশ টাকা।

কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল। তাঁর মধ্যে পরস্পর-বিরোধী বক্তব্য আছে। যেমন কখনও তিনি শোষিত জনের কথা বলেন, পরক্ষণে শোষণকারীর জয়গান করেন, কখনো সাম্যের কথা বলেন, আবার তার বিপক্ষে বলেন, স্বাধীনতার গুণগান করতে গিয়ে পরাধীনতার পক্ষেও কথা বলেন; মুখে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বলেন, লেখায় তার জয়গান করেন। আমাদের দেশের পাঠকসমাজ বঙ্কিমের এই দ্বৈত ব্যক্তিত্বের কথা ভালোভাবে নেন না, যাঁরা তাঁর সম্পর্কে যে ধারণা আগে থেকে করে নিয়েছেন তার বাইরে যেতে চান না। তাঁর সাহিত্য-মানসের বৈপরীত্যের কথা বলার অর্থ এ নয় যে তাঁর কৃতিত্বকে খাটো করা; তাঁর শক্তিমত্তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও যুক্তিসহকারে দোষত্রুটির কথা বলেও বহুদিনের লালিত ধারণাকে বদলানো যায় না।

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের প্রয়াসকে তিনি সুনজরে দেখেন নি। হিন্দু ধর্মের সংস্কারের কথা বলেছেন, অথচ তিনি সেই সংস্কারকে অতিক্রম করতে পারেন নি। বাঙলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার কথা মেনে নিয়েও ১৮৭০ সালে Bengal Social Science-এর সভায় প্রদত্ত ভাষণে শিক্ষাপ্রসারের জন্য বাঙলা ভাষা মাধ্যমে জনসাধারণকে আকৃষ্ট করা বিশেষ প্রয়োজন সেকথা বলেন নি (দ্র "বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ", ড. অমলেন্দু দে ১৯৭৪ সন, পৃ ২০৫)। তাঁর প্রাণ কাঁদত কৃষকদের জন্য, "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে বেরোয় ১৮৯২ সালে। অথচ ১৮৮৫ সালে প্রজাস্বত্ব আইন পাশ হয়। এই আইন জমিদার ও কৃষকের মধ্যে মালিকানা স্বত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র এই সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। বরং এই আইন প্রবর্তনের পরে তিনি লিখেছিলেন, 'জমিদারের আর সেরূপ অত্যাচার নাই···তাঁহাদের ক্ষমতাও কমিয়া গিয়াছে। অনেক স্থলে এখন দেখা যায় প্রজাই অত্যাচারী, জমিদার দুর্বল।' পরবর্তী কালের ইতিহাস সেকথা বলে না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান হলে অরাজকতার সৃষ্টি হবে—এমন কথাও তিনি বলেছেন: 'আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি। বিশেষ যে বন্দোবস্ত ইংরেজরা সত্যপ্রতিজ্ঞা করিয়া চিরস্থায়ী করিয়াছেন, তাহার ধ্বংস করিয়া তাঁহারা এই ভারত-মণ্ডলে মিথ্যাবাদী বলিয়া পরিচিত হয়েন, প্রজাবর্গের চিরকালের অবিশ্বাসভাজন হয়েন, এমত কুপরামর্শ আমরা ইংরেজদিগকে দিই না। যেদিন ইংরেজদের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইব সেইদিন সেই পরামর্শ দিব।' স্বৈরাচারী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে শোষক জমিদারের বিরুদ্ধে গোটা উনিশ শতকে নিরবচ্ছিন্ন গণ-অভ্যুত্থান তথা কৃষকবিদ্রোহ চলেছে। শাসকের বিরুদ্ধে এই নিরন্তর সংগ্রাম দেশে জাতীয়তাবোধ এবং স্বাধীনতার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করতে সহায়তা করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র এই চেতনাকে কাজে লাগান নি। সেদিন খেটেখাওয়া ব্রাত্য মানুষদের অধিকার প্রতিষ্ঠার যে লড়াই শুরু হয়েছিল, তাকে তিনি শুধু প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হন নি, তাকে নিরস্ত করার জন্য জমিদার-শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। সুপ্রকাশ রায় বলেছেন: 'বঙ্কিমের ধ্যানধারণা সহানুভূতি ছিল সামন্ততান্ত্রিক সমাজের নীতিবোধের শৃঙ্খলে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। বঙ্কিম তাই বিপ্লবকে ভয় করিতেন মহামারীর মত। এইজন্যই তিনি স্বাধীনতা-কামী সংগ্রামী জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে পারেন নাই। বরং তাহাদের নিবৃত্ত করিতে চাহিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, 'অনেক কাল আমাদের পরাধীন থাকিতে হইবে, সুতরাং ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য হাত মিলান উচিত।"' ("ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম", ৩য় সংস্করণ ১৯৮০ পৃ ২১১) প্রধানত এই কারণেই "নীলদর্পণ" ও "জমিদারদর্পণ"-এর প্রচার বঙ্কিমচন্দ্র আন্তরিকভাবে চান নি—কারণ তাঁর মতে, 'ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে অনেক নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা

আমরা জানিতাম না তাহা জানিতেছি; যাহা কখনও দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে।' ("ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?" বিবিধ প্রবন্ধ) জাতীয়তার মন্ত্রগুরুরূপে সম্মানিত হলেও স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর যে দ্বিধা ছিল, তার প্রমাণও আছে। "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা" প্রবন্ধে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, 'অনেকে রটনা করিয়া বলিবেন তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতার তুল্য? তবে পৃথিবীর তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপাত করে কেন? যাঁহারা এইরূপ বলিবেন, তাঁহাদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, আমরা সে তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমরা পরাধীন জাতি, অনেক কাল পরাধীন থাকিব—সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই।' (বিবিধ প্রবন্ধ) সেজন্য তাঁর প্রত্যাশা ছিল ইংরেজরা এদেশে জাতি প্রতিষ্ঠা করে দেন। তাঁর এ প্রত্যাশা যে কত বড়ো ভুল ছিল, পরবর্তী কালের ইতিহাস তা প্রমাণ দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে দুজন লেখক—কী দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, কী অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—এসব বিষয়ের কোনো উল্লেখ করেন নি, অথচ বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রবন্ধসাহিত্য নিয়েই বঙ্কিমের নানাদিকের পরিচয় দিয়েছেন; বলার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, সুযোগ তাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে নেন নি। কারণ, প্রচলিত বক্তব্যের বিরুদ্ধে যেতে সাহস করেন নি। প্রধানত তাঁরা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বহুদিনের সযত্নলালিত ধারণাগুলির ওপর নতুন করে দাগা বুলিয়েছেন—দেশ ও দশের ওপর ভালোমন্দ ফলাফলের বিচারও করেন নি। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের মানুষ, তাঁর ঐতিহাসিক দৃষ্টি এদিকে এড়িয়ে গেল কী করে, তা বোধগম্য হল না। দুজন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রায় এক, বিষয়বস্তুও এক, বিশ্লেষণ ও বক্তব্য প্রায় এক। বই দুটির সূচীপত্র পাশাপাশি তুলে দিলে দেখা যাবে—দুজন লেখকই বঙ্কিমচন্দ্রের একই দিকের কথা বলেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের "বঙ্কিম-সন্ধিৎসা"-র সূচীপত্র:

: বঙ্কিম মানসের বিবর্তন পৃ ১-২০ / বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনজিজ্ঞাসা: উপন্যাসে, বিবিধ রচনায় ২১-৪২ / ইতিহাস-জিজ্ঞাসা ও স্বদেশ-ভাবনা ৪৩-৭৭ / সমাজ-জিজ্ঞাসা ৭৮-১০০ / সাহিত্য-জিজ্ঞাসা ১০১-১১৮ / ধর্ম-জিজ্ঞাসা ১১৯-১৫১ / উপসংহার ১৫২-১৬৬।

অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম সমীক্ষা'র সূচীপত্র:

: কথামুখ পৃ ১-৪ / ইয়োরোপীয় দর্শন ৫-৪০ / হিন্দুধর্ম ৪১-১০৫ / হিন্দু দর্শন ১০৬-১৩৩ / কৃষ্টির জেহাদ ১৩৪-১৬০ / ধর্মতত্ত্ব ১৬১-১৯১ / কৃষ্ণচরিত্র ১৯২-২১৬ / শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২১৭-২২৮ / বাঙলার হিন্দু সমাজ ২২৯-২৫৩ / বঙ্গদেশের কৃষক ২৫৪-২৬৫ / ইতিহাস-চিন্তা ২৬৬-২৮৬ / বন্দেমাতরম্ ২৮৭-৩১২ / ত্রয়ী ৩১৩-৩২৫ / জাতীয়তাবাদ ৩২৬-৩৩৯ / কথাশেষ ৩৪০-৩৪৬।

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথের পরিশীলিত মেদহীন অনুভূতিময় প্রবন্ধ বিদগ্ধজনের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। সুমিত বয়নের চমৎকৃতি সরস অবগাহনের সাবলীল গভীরতা তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে পাই। 'বঙ্কিম-সন্ধিৎসা' তার ব্যতিক্রম নয়। 'বঙ্কিম মানসের বিবর্তন' অধ্যায়ে পরিবেশ পরিজন ও দেশকালের প্রভাব বলেছেন। মোটামুটি বঙ্কিম-মানসের ধারাবাহিকতা পাঠক ধরতে পারেন। বক্তব্যের মাঝে-মাঝে অন্যের অভিমতের জবাব দিতে গিয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন, কিন্তু প্রকৃত জবাব দিতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, 'বঙ্কিম জমিদার এবং রাজা-রাজড়াদের নিয়ে গল্প-উপন্যাস লিখেছেন, তাঁর শিল্পী-ব্যক্তিত্বে আধুনিক কথাসাহিত্যিকদের মত তীক্ষ্ণ সমাজচেতনা ছিল না, —এ যুগের বঙ্কিম-সমালোচকদের মুখে এমন অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। এ অভিযোগ কত ভিত্তিহীন বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত লোকরহস্য এবং কমলাকান্তের দপ্তরের সরস ও আবেগদীপ্ত রচনাগুলি তার প্রমাণ।'

(পৃ ৯) উপন্যাসে সাধারণ মানুষের পদসঞ্চার ছিল না—একথাই আধুনিক সমালোচকরা বলেছেন। "লোকরহস্য" ও "কমলাকান্তের দপ্তর"-এ সাধারণ মানুষের কথা থাকতে পারে, বঙ্কিম তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন, কিন্তু সেটা আধুনিক সমালোচকদের প্রশ্ন নয়। তাঁদের প্রধান অভিযোগ বঙ্কিমের উপন্যাস সম্পর্কে। শ্রী নাথ তার জবাব না দিয়ে "লোকরহস্য" ও "কমলাকান্তের দপ্তর"-এর দোহাই পেড়েছেন। শুধুমাত্র উদাহরণ দিয়েছেন, কোনো বিশ্লেষণ করে বক্তব্যকে স্পষ্ট করেন নি। পক্ষান্তরে, 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের ব্যাখ্যা দিয়ে বঙ্কিমের সমাজচেতনার পরিচয় দিতে চেয়েছেন, তেমনি বঙ্কিম-মানসে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র বোঝাতে গিয়ে "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন। বঙ্কিম-উপন্যাসে কোথাও দুঃখী শোষিত মানুষের চরিত্র নেই—রাজা জমিদার যোদ্ধা সন্ন্যাসী এবং তাঁদের সুখ-দুঃখ নিয়েই তিনি ব্যস্ত। বঙ্কিম-অনুরাগীরা সাধারণত বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের খামতির দিকের জবাবে "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধের উল্লেখ করে থাকেন—শ্রী নাথও তাই করেছেন। "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধে কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশায় তাদের স্বার্থরক্ষায় তিনি যে খুব সচেতন ছিলেন, তা মনে হয় না—বর্তমান আলোচনার প্রারম্ভে আমি তার আভাস দিয়েছি। অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুটা মূল্যায়নের চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কোনো পক্ষকেই—কী জমিদার, কী কৃষক, কী শাসক—কাউকেই চটাতে চান নি বলে কোনো পক্ষই তাঁকে আপন লোক বলে মেনে নিতে পারে নি। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, 'জমির প্রকৃত মালিক কে—চাষী, জমিদার, না সরকার? বঙ্কিম এই মূল প্রশ্নের আলোচনা করেন নি।...প্রজাই জমির মালিক, একথা তিনি বলেন নি।' (পৃ ২৬৪) তবে বঙ্কিমচন্দ্র দেশ ও সমাজের ভিত গঠনে কৃষকের একটি বড়ো ভূমিকা আছে, সেকথা অস্বীকার করেন নি, বরং দৃঢ়তার সঙ্গে যে কথা বলেছিলেন সেরকম কথা তাঁর সমকালে আর কেউ বলেন নি 'দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? ...তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ...তোমা হইতে আমা হইতে কোন কার্য হইতে পারে? কিন্তু সকল কৃষিজীবী ক্ষেপিলে কে কোথায় থাকিবে? কি না হইবে? যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।' শ্রেণীবৈষম্য বিলোপ করে উৎপাদনের ভিত্তিতে শোষণহীন সমাজব্যবস্থার যে সাম্যবাদ, তা বঙ্কিমের কাছে আশা করা অন্যায় আবদার করা হবে—তিনি প্রধানত রুশো ভলটেয়ার প্রবর্তিত সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ধর্মতত্ত্ব আলোচনায় বঙ্কিম যখন গভীরভাবে মগ্ন, তখন "সাম্য" গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করে দেন—শ্রীকৃষ্ণই তখন তাঁর আদর্শপুরুষ হয়ে উঠেছেন। 'বঙ্কিম-মানসের বিবর্তনে' শ্রীনাথ এসব কথা উল্লেখ করেছেন এবং আলোচনান্তে যে কথাটি বলেছেন তাতে মতবিরোধ হবার কোনো কারণ দেখি না, 'যৌবনে বেন্থামের হিতবাদী জীবন-দর্শন, কোমতের নিরীশ্বরবাদী মানবপূজা এবং রুশো-ভলটেয়ারের সাম্যবাদী জীবনাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও জীবন-পরিণতিতে পরিশ্রমী প্রয়াস, স্বাধীন চিন্তা-বিচার এবং অনুশীলনের সাহায্যে স্বদেশের ধর্ম এবং দর্শনের ভেতর সর্বভূতে প্রীতি এবং সমদর্শনের আদর্শ আবিষ্কার নিঃসন্দেহে বঙ্কিম-মনীষার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।' (পৃ ১৯-২০)

বঙ্কিমের কথাসাহিত্য বাদ দিয়ে বঙ্কিমের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না—এ তথ্যটি শ্রীনাথ কখনও ভোলেন নি। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তথ্যটি স্মরণে রেখেছেন, গ্রন্থ মধ্যে সেটি আনেন নি। তিনি নিবেদন অংশে বলেছেন, 'কাব্য (উপন্যাস) ও বিজ্ঞান এক পাশে সরিয়ে রেখে ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্বকে আমি বেছে নিয়েছি।...উপন্যাস বাদ দিয়ে বঙ্কিম-প্রতিভার সামগ্রিক মূল্যায়ন সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবে আমি যে সীমিত ক্ষেত্রে আবার দৃষ্টি সঙ্কুচিত রেখেছি সেখানে তাঁর অনুভব ও উপলব্ধির জগৎকে যথাসম্ভব সঠিক-ভাবে আত্মগত করার চেষ্টা করেছি।' শ্রীনাথ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনজিজ্ঞাসার যে সন্ধান করেছেন সেটি বেশ উপভোগ্য। বঙ্কিমের মুসলিম-বিদ্বেষও তিনি স্বীকার করে বলেছেন, উপন্যাসে চিত্রিত কোন কোন চরিত্র প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট ভারতেশ্বর ঔরঙ্গজেবের প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং অপমানজনক ব্যবহারের পরিচয় দিয়ে সুরুচির সীমা লঙ্ঘন করেছে বলে এ-যুগের কোন কোন সমালোচক যে মন্তব্য করেছেন তার সমীচীনতা অস্বীকার করা শক্ত। ধর্মদ্বেষীর প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত ক্রোধ প্রকাশে মানবধর্মবেত্তা বঙ্কিম যদি আর একটু সংযম এবং সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেন, তবে পরবর্তী কালে সমালোচকেরা তাঁর বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আনার কোন সুযোগ পেতেন না।' (পৃ ৩৩-৩৪) শ্রীনাথ আধুনিক সমালোচকদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেছেন—একালের সমালোচকেরা আধুনিক দৃষ্টিতে উনিশ শতককে দেখেন বলে অনেক ক্ষেত্রে অবিচার করা হয়েছে বঙ্কিমের উপর। লেখকের মতে, 'দেবী চৌধুরানী উপন্যাসে প্রফুল্ল বাইরের দুঃসাহসী জীবনের মোহ ছেড়ে সতীন-পরিবৃত স্বামীগৃহে ফিরে আসা স্বাভাবিক এবং নিষ্কাম কর্মে লিপ্ত হয়ে নারীজন্ম সার্থক করার স্বপ্ন দেখা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। কালোত্তীর্ণ সাহিত্য যদি বঙ্কিমের সাহিত্য হয়ে থাকে, তাহলে তার বিচার শুধু সে যুগের নিরিখেই কেন হবে? আজকের দিনে তার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা খতিয়ে দেখাও দরকার। আজকের দৃষ্টিতে উনিশ শতককে দেখা দোষাবহ নয়, কারণ উনিশ শতকের ধারাবাহিকতা আমাদের সমাজে যে অকল্যাণের সৃষ্টি করেছে, তার বিচার আজকের দৃষ্টিতেই হওয়া উচিত বলে মনে করি। বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর যুগে প্রগতিশীল বলে যদি কেউ বলে থাকেন, তাহলে পিঠোপিঠি একথাও উঠতে পারে, যে কালে সতীদাহপ্রথা ও বহুবিবাহ নিন্দার্হ বলে বিবেচিত হচ্ছিল, সেই সময় বঙ্কিম প্রগতির পক্ষে না থেকে রক্ষণশীলতার পরিচয় কী করে দিলেন? "মৃণালিনী" উপন্যাসে মনোরমা নামে এক অল্পবয়স্কার সহমরণে যাবার কথা বর্ণিত হয়েছে।

মোহিতলাল বলেছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত জিজ্ঞাসার আশ্রয়ভূমি দিল স্ব-দেশ স্ব-জাতি স্ব-ধর্ম। স্ব-দেশ বঙ্গদেশ, স্ব-জাতি বাঙালি, স্ব-ধর্ম হিন্দুধর্ম। ফলে, বঙ্কিমের দেশজাতিধর্মভাবনা বিশ্বজনীন নয়, আত্মজনীন। তাঁর যাবতীয় ধর্মজিজ্ঞাসা হিন্দুধর্মকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। আলোচনার সুবিধার্থে শ্রীনাথ বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসাকে দু-ভাগে ভাগ করেছেন—ধর্ম সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা, ধর্মের সারবস্তু সন্ধানে হিন্দুধর্মের পর্যালোচনা। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্ম-মতের আলোচনাটি শ্রীনাথের থেকে তথ্যনিষ্ঠ। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমের ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করার আগে ইউরোপীয় দর্শন, হিন্দুদর্শনের মূলকথাগুলি বলেছেন; সে সময়কার হিন্দু সমাজ কেমন ছিল, হেস্টির সঙ্গে বাদানুবাদ প্রসঙ্গ, বঙ্কিমচন্দ্র সেই ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে স্বধর্মে ফিরিয়ে আনার জন্য কী কী প্রয়াস করেছিলেন, তার ফিরিস্তি দিয়েছেন। আলোচনার মধ্যে লেখকের ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে সাহিত্য-রসজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। "ধর্মতত্ত্ব", "কৃষ্ণ-চরিত্র" গ্রন্থগুলি পৃথক-পৃথক আলোচনা করে কোন্ কোন্ প্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র মতপ্রকাশ করেছিলেন তারও তথ্য উল্লেখ করেছেন বলে ধর্মজিজ্ঞাসা প্রসঙ্গটি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

শ্রীনাথ বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন বলে স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিমের সাহিত্যজিজ্ঞাসারও একটি অধ্যায় রচনা করে বঙ্কিমবৃত্তকে পূর্ণতা দান করেছেন। এই অধ্যায়ে তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্যতত্ত্বের পটভূমিকায় বঙ্কিমের সাহিত্যভাবনা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন বঙ্কিমের সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি কতটা

অভ্রান্ত ছিল, সংস্কৃত আলঙ্কারিক ও ভারতীয় ঐতিহ্যের দ্বারা কী পরিমাণে সমৃদ্ধ ছিল এবং স্বকাল ও ভাবীকালের জন্য সাহিত্যের উন্নত আদর্শ কিভাবে গড়ে দিয়েছেন। লেখকের মতে, তুলনামূলক সাহিত্য-সমালোচনা-পদ্ধতির প্রথম আবিষ্কারক তিনি, সাহিত্যের মান ও শুদ্ধতা কী করে রক্ষা করা যায় এবং সেজন্য বাংলা একাদেমী গড়ার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন ১৮৭২ সালে। মোট কথা, তিনি এমন একটা সাহিত্যরুচি ও বাঁধন বেঁধে দিয়েছিলেন উত্তরসূরীরূপে এখনও তার ফল আমরা সানন্দে ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উপভোগ করছি।

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের অধ্যাপক হবার দরুন তিনি ইতিহাসচিন্তার সঙ্গে যুক্ত জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, তিনি উনিশ শতকের রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক বাতাবরণে বঙ্কিমকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। শ্রীনাথও ইতিহাসজিজ্ঞাসা ও স্বদেশভাবনা অধ্যায়েও তাই করেছেন। স্বদেশের গৌরবময় ইতিহাস রচনা করার জন্য বঙ্কিমের ব্যাকুলতার মধ্যেই বঙ্কিমের স্বজাতি- ও স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে বঙ্কিমের ইতিহাসচিন্তার মধ্যে কিছু ত্রুটি ছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। যেমন, মুঘল শাসনে বাঙলার অধঃপতন হয়েছিল কিংবা হিন্দুরাজ্যে জমিদার ছিল না, হিন্দুরাজ্যকালে প্রজাপীড়ন হয় নি। বঙ্কিমের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি আঞ্চলিকতাদোষ দুষ্টি ছিল। আত্মবিস্মৃত বাঙালিকে সচেতন করার জন্যই তিনি এই পথ গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার কিংবা তথ্যের সত্যতা নির্ণয়ের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীনাথ উভয়েই উল্লেখ করেছেন—

: বঙ্কিমের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আত্মবিস্মৃত বাঙালী সমাজের সঙ্গে তার পুরাতন ঐতিহ্যের সংযোগ সাধন। (বঙ্কিম-সমীক্ষা, পৃ ২৮৬)।

: স্বদেশের অতীত গৌরবকে সমকালীন আত্মভ্রষ্ট জাতির সামনে উপস্থিত করে তাদের মনে সাহস, আত্মমর্যাদা এবং দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলবার জন্য তিনি যে ক্লান্তিহীন প্রয়াসের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার তুলনা আধুনিক বাঙালীর ইতিহাসে দুর্লভ। (বঙ্কিম-সন্ধিৎসা, পৃ ৭৭)।

গ্রন্থশেষে দুই লেখক যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তার মধ্যেও অন্তরগত মিল। 'উপসংহার' অধ্যায়ে শ্রী নাথ বলেছেন, 'নির্মোহ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টির সাহায্যে বঙ্কিম ধর্মজিজ্ঞাসায় মানব-বাঞ্ছিত যে পরমসত্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন, সে সত্য অবক্ষয়ী জাতিকে সার্বিক অভ্যুদয়ের পথ দেখিয়েছে' (পৃ ১৬৬)। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় 'কথাশেষ' অধ্যায়ে বলেছেন, 'বঙ্কিম দেশের অগ্রগতির পথই দেখিয়েছেন, তাকে পিছনে ঠেলে দেবার চেষ্টা করেন নি' (পৃ ৩৪৬)। উভয় লেখক তাঁদের সিদ্ধান্তকে গ্রন্থমধ্যে প্রমাণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিম সম্পর্কে ঘোষিত বক্তব্যগুলিকেই তাঁরা লালন করেছেন—বঙ্কিমের পরস্পরবিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে তাঁরা দুজনেই নীরব থেকেছেন।

প্রভাতকুমারের গল্প

গলাতন মিত্র

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের পর বাঙলা সাহিত্যের একজন অগ্রগণ্য গল্পলেখক। তিনি নাকি আরও অনেক লেখকের মতো কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করেন, এবং রবীন্দ্রনাথই নাকি তাঁকে পদ্য ছেড়ে গদ্যে এবং বিশেষ করে ছোটোগল্প লেখায় হাত লাগাতে উপদেশ দেন। সে উপদেশ রবীন্দ্রনাথ যদি নাও দিতেন, প্রভাতকুমার নিজেই নিজের সঠিক রাস্তা বেশি কালক্ষেপ না করে খুঁজে নিতেন, সে বিষয়ে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত হতে পারি। আর কিছু থাক বা না থাক, একটা সুগভীর কাণ্ডজ্ঞান এবং বাস্তববোধের পরিচয় যাঁর লেখায় এত স্পষ্ট, তিনি যে যা-হবার-নয় তার পেছনে দীর্ঘকাল সময় আর শক্তির অপব্যয় করতেন, বিশ্বাস করা কঠিন।

সাহিত্যিক হিসেবে বামন তাঁকে কোনো হিসেবেই বলা চলে না, কিন্তু তিনি কোনো দিন চাঁদে হাত দিতে যান নি। যেসব সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভালো-মন্দ নিয়ে আমাদের দিনযাপন, যেসব বাধাবিপত্তি এবং তার সঙ্গে লড়াই করে জেতা এবং হারা নিয়ে আমাদের জীবনের ইতিহাস, কখনও কৌতুকে, কখনও বেদনায় সেসবই দানা বেঁধে গল্প হয়ে উঠেছে তাঁর কলমে। তার মধ্যে কোনো দানাটি মুক্তোর মতো দ্যুতিমান, কোনোটি হয়তো ক্ষীণপ্রভ। কিন্তু বায়বীয় কোনোটিই নয়। প্রভাতকুমার বুদ্‌বুদবিলাসী ছিলেন না। মজাদার গল্পের খোঁজে তিনি বাদশাহ-বেগমের জগতেও প্রবেশ করেছেন, কিন্তু সেসব গল্পের মজাও জিন-পরীদের নিয়ে নয়; যাদের নিয়ে, তাদের মুখের হাসিটি, চোখের চাউনিটি, কায়দাটি, কানুনটি—সবই আমাদের চেনা। যেমন ধরুন "কাজির বুদ্ধি" নামে গল্পটি। এ ধরনের গল্পকে 'সাহিত্য' বলা যায় কিনা জানি না, কিন্তু এর কৌতুকটি এতই উপাদেয়, 'শঠে শাঠ্যম' জাতীয় এর কাহিনীটির ভাঁজে-ভাঁজে মানুষের দোষ-দুর্বলতার উদ্ভাসন এমন সুচারু এবং তৃপ্তিদায়ক যে, বলতে ইচ্ছে করে, এই বেশ হয়েছে। মানতেই হয়, সাহিত্য হোক বা না হোক, এ শিল্প বটে। এবং, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে বাকি থাকে না, এ শিল্পের নির্মাণ তারই পক্ষে সম্ভব যার স্বভাবে সুদীর্ঘ কালের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি একটা সুসমৃদ্ধ উত্তরাধিকার রেখে গেছে, যার শিক্ষাদীক্ষা ঢাক পিটিয়ে নিজেকে জাহির করে না—কণ্ঠস্বরে, বাচনভঙ্গিতে, সংযমে, সৌষ্ঠবে, অভ্রান্ত পরিমিতিবোধে অনিবার্যভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। সহজ, স্বচ্ছন্দ, অনায়াস এর লিপিকৌশল, সহজ-সুন্দর মেদভারহীন এর গতিচ্ছন্দ। এ গল্পের ছত্রে-ছত্রে লিখিত আছে, শুধু কথাশিল্পের নির্মাণে নয়, একটা সভ্যতার গড়ে তোলায় মানুষের সুদীর্ঘ সাধনার ইতিহাস।

অথচ গল্পটি প্রভাতকুমারের নেহাতই একটি অপ্রধান রচনা, যতদূর মনে পড়ে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে লেখা। আসলে তাঁর পক্ষে এমন কিছু লেখা প্রায় অসম্ভবই ছিল, যা পড়ে যেতে ভালো লাগে না, যা পড়লে কলমের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে। তার প্রধান কারণ, তিনি কী করতে পারেন এবং কী করতে চান সে বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। অন্তত তাঁর ছোটোগল্পের সম্পর্কে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তিনি ছোটো-ছোটো জিনিস স্পষ্ট করে দেখতে এবং দেখাতে ভালোবাসতেন; উপন্যাসে, তা সে টলস্টয়েরই হোক কিংবা জেনে অস্টেনেরই হোক, গোরাই হোক কিংবা "চোখের বালি"-ই হোক, ডালপালা অনেকখানি ছড়িয়ে দিতে হয়। প্রভাতকুমারের ঝোঁকটা সেদিকে ছিল না। কিন্তু ছোটোগল্প কুমোরের হাতের কৌশলে ঘুরন্ত মাটির তাল থেকে যেমন নানা বস্তু আকার নিয়ে বেরিয়ে আসে, তেমনি বেরিয়ে আসত প্রভাতকুমারের হাত থেকে। চলন্ত জীবন তাঁর হাতে ছিল সেই ঘুরন্ত কুমোরের চাক।

নানা রঙের, নানা স্বাদের, নানা ওজনের গল্প, তার কোনোটি প্রসন্ন শরতের আলোয় ঝলমল করছে, কোনোটির ওপর মেঘমেদুর বর্ষার ছায়া, কোনোটি ক্ষিপ্রগতি, লঘুভার, কোনোটি শান্ত, মন্থর। কিন্তু কলমটি যে সর্বত্রই প্রভাতকুমারের হাতে ধরা, তাতে ভুল হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সম্পূর্ণ অন্য এক প্রসঙ্গে অন্য একজন মহাপ্রতিভাধর ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ বলেছিলেন, 'থাবা দেখলেই সিংহ চেনা যায়।' প্রভাতকুমারের থাবা সিংহের থাবা—এমন দাবি না করেও বলা যায়, এই একশো চব্বিশটির মধ্যে

প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের গল্পসমগ্র। সম্পাদনা : প্রফুল্লকুমার পাত্র। পাত্র'জ পাবলিকেশন, কলিকাতা-৭৩। নব্বই টাকা।

অসাধারণ ভালো গল্প, সাধারণ ভালো গল্প, মাঝারি গল্প, এমনকী যাকে বলা যায় নিরেস গল্প—সবরকমই আছে, কিন্তু তার মধ্যে এমন একটিও খুঁজে পাওয়া মুশকিল যার নির্মাণে এবং বুনোটে প্রভাতকুমারের হাতের ছাপ পড়ে নি।

আসলে ছাপটা ঠিক হাতের নয়। লেখকের দৃষ্টির, বিচারের, চিন্তাভাবনার, চিত্তবৃত্তির। মানবজীবন-নামা একটা বৃহৎ জটিল ব্যাপার যেভাবে তাঁর মানসলোকে প্রতিভাত হয়, তার সমগ্র বিশিষ্টতাটা লেখার মধ্যে নিরন্তর নিজেকে প্রকাশ করে চলে। কোন্ নিসর্গ-চিত্রটি কনসটেবলের, আর কোন্‌টি টার্নারের রচনা, কোন্ লেখাটি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর আর কোন্‌টি নরেন্দ্রনাথ মিত্রের—চিনে নিতে পারি এক মুহূর্তে। "বাল্যবন্ধু" নামে প্রভাতকুমারের একটি গল্প আছে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে আমরা বলতে পারি—রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্রের বলায় গল্প এ নয়, যে চোখ দিয়ে মানুষকে দেখলে, তার জয়-পরাজয়ের ইতিহাসকে দেখলে, তার সাধ্য ও সাধনাকে দেখলে, তার মধ্যেকার ভালোমন্দের সম্ভাবনাকে দেখলে এ গল্প দানা বেঁধে ওঠে, তাঁরা সে চোখে তাকান নি মানুষের দিকে। এর হিসেব জীবনের পাইপয়সা নিয়ে, যে পাই-পয়সা একটি-একটি করে জমে উঠে মানুষের জীবনে পর্বতাকার হয়ে ওঠে। একটু-একটু করে ক্ষয় হতে-হতে মানুষের জীবন নিঃস্ব হয়ে যায়, একটু-একটু করে জমার অঙ্ক বাড়িয়ে আবার তাকে গড়ে তুলতে হয়। মানুষের যা সাধ্য, সেই পথেই তার সাধনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। এই গল্পে যে "বাল্যবন্ধু" সে এক অধঃপতিতকে সার্বিক বিনাশ থেকে এইভাবেই উদ্ধারের পথে এনে দাঁড় করিয়ে দিল। এই ভাবেই, একরকম তাকে বাধ্য করল নিজের হাতে নিজের দুর্দশা মোচন করতে।

এ এক অবিস্মরণীয় গল্প, অথচ এর মধ্যে তার দৈনন্দিন জীবন, তার অতিসাধারণ স্খলন-পতন, তার একান্ত পারিবারিক সুখ-দুখ, আশা-নিরাশা—এসবের বাইরে কোনো কথা নেই। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।' ক্ষুদ্র মানুষ, দুর্বল মানুষ, আত্মরক্ষায় অক্ষম মানুষ, তার নিজের ভেতর থেকে কী করে বেরিয়ে আসতে পারে নিজেকে বাঁচাবার শক্তি, পারিবারিক বন্ধন কী করে তাকে মুক্তির পথে স্থাপিত করতে পারে, সে কাহিনীর এমন সুনিয়ন্ত্রিত, সংযত, জীবনযাত্রার ছন্দের সঙ্গে সুসমঞ্জস উন্মোচন, বাইরে থেকে দেখতে একে যতই সহজ, যতই অনায়াসলব্ধ মনে হোক, যে-কোনো পাঠকই একটু ভেবে দেখলে বুঝতে পাবেন, গল্প বলার শিল্পে অসাধারণ অধিকার স্থাপিত করতে না পারলে এ জিনিস সম্ভব হতেই পারে না।

"আদরিণী" গল্পটি প্রায় আমাদের সকলেরই চেনা। বোধহয় গল্পটি এত পরিচিত বলেই, তার সৌন্দর্য এত সহজ বলেই, তার ভাষা এত স্বচ্ছ, তার গতি এত সাবলীল বলেই আমরা লক্ষ করি না কী অভ্রান্ত শিল্পবোধ এর মধ্যে কাজ করছে। ভাবলে অবাক হতে হয়—কী অনায়াসে এ মানুষের মমত্ববোধকে (একেবারে আক্ষরিক অর্থে 'মমত্ব') মানবজাতির গণ্ডি পার করে দিয়েছে। কিন্তু শুধু কি তাই? গল্পের স্বাদ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে আরও নানা রসের সম্মেলনে। তার মধ্যে স্মিত হাস্য আছে, মানুষের মানবিক দুর্বলতা নিয়ে স্নিগ্ধ কৌতুক আছে, এর মৌলিক কল্পনাটার মধ্যে, যাকে বলে 'অ্যাবসার্ড' তারও একটা অতিশয় উপভোগ্য উপাদান আছে। সব মিলে যে রাসায়নিক যৌগিক পদার্থটি লেখক সৃষ্টি করেছেন, সাহিত্যে তার সমতুল্য বস্তু দুর্লভ।

নিছক কৌতুকরসের গল্পেও প্রভাতকুমার দু-একটি কালির আঁচড়ে ত্রিমাত্রিক মানুষের চরিত্র সৃষ্টি করতে পারতেন। যেমন, "বিবাহের বিজ্ঞাপন" গল্পে গাজীপুরের রামঅওতার এবং কাশীর মহাদেও মিশ্র। সঙ্গে-সঙ্গে কাশীর গলিও জীবন্ত হয়ে উঠেছে এ গল্পে। এরও পরতে-পরতে রস, "কাজির বুদ্ধি"তে যেমন দেখেছি, এতেও গল্পের রসকে সমৃদ্ধ করেছে মনুষ্যচরিত্র

এবং তার পারিপার্শ্বিক। প্রভাতকুমারের যেসব গল্পে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই, তার প্রত্যেকটিতেই মনে হয় মানুষের জীবন শুধু নয়—সমাজ-সংসারের যে অংশটুকুতে তার অবস্থান, তাও উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এক স্ফটিক-স্বচ্ছ দিবালোকে। বাস্তবতার নিজস্ব যে রস, যা হতে পারে, যা হয়ে থাকে, যা সম্ভবপর এবং প্রত্যাশিত, তারই সীমার বন্ধনটাকে আমরা সনেটের চোদ্দ লাইনের বাঁধনের মতো মনে করতে পারি, এবং তখন বুঝতে পারি সেই সীমার মধ্যে থেকে একের পর এক শিল্পগুণসমৃদ্ধ কাহিনী রচনা করে যাওয়ার যে চ্যালেনজ, প্রভাত-কুমারের মতো শিল্পীর কাছে সেটাই হতে পারে সৃষ্টির একটা প্রেরণা।

তাই তাঁর মজার গল্পেও মজাটা কোথাও একান্ত বাস্তবকে ছাড়িয়ে যায় নি। "বলবান জামাতা" কিংবা "রসময়ীর রসিকতা", যা সম্ভবপর তারই শিল্প, তার কোথাও অতিরঞ্জনের কোনো স্থান নেই। কোথাও মনে হয় না বিশ্বাসযোগ্যতার সীমা নিয়ে টানাহেঁচড়া করবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছেন।

বিদেশের পটভূমিতে তাঁর যেসব গল্প (তার মধ্যে কয়েকটি নিঃসন্দেহে তাঁর শ্রেষ্ঠ গল্প বলে গণ্য হবার মতো) তাতেও দেখি সেদেশের আবহাওয়া, তার সমাজ তার রীতিনীতি, তার অধিবাসীদের জীবন-যাত্রা, এবং বিশেষ সেখানে উপস্থিত বঙ্গীয় যুবকদের হালচাল, তাদের নানা রকমের অভিজ্ঞতা কী রকম স্বচ্ছন্দে, মনে হয় যেন তুলির আলতো ছোঁয়ায় ফুটিয়ে তুলেছেন। কোথাও বাস্তবতা থেকে কোনো বিচ্যুতি আছে বলে মনে হয় না, অথচ বস্তুর ভারেও আমরা কখনও পীড়িত বোধ করি না। যে ছন্দে সেখানকার জীবন বয়ে যায়, সেই ছন্দটিই যেন তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর লেখার সঙ্গে। "প্রবাসিনী" নামে গল্পটি বাঙলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ। এর পরিশীলিত রসিকতা, এর সূক্ষ্ম কারুকার্য, একমাত্র তেমন লেখকের কাছ থেকেই আমরা আশা করতে পারি, একটা অতিশয় সমৃদ্ধ সংস্কৃতি যাঁর চিত্ত, বুদ্ধিবৃত্তি, রুচি এবং অনুভূতিসমূহ সমৃদ্ধ করে তুলেছে।

কবি এবং সাহিত্যিকদের নিয়েও অনেক মজা আছে এঁর গল্পে। কিন্তু সেগুলি প্রধানত অপ্রধান রচনার শ্রেণীতে পড়ে, যদিও তার মধ্যেও কোনো না কোনো এক ধরনের উৎকর্ষ দেখতে পাই। "মাষ্টার-মশাই"ও নিছক মজারই গল্প, এবং এর মজাটাও ইস্কুলের ছেলেদের স্তরের (আই ডোনট নো মানে কী বল তো? আমি জানি না) কিন্তু এর মধ্যে আসল মজা দুই গ্রাম এবং তাদের রেষারেষি নিয়ে। বিলেতের পটভূমিকায় "বিলাতী রোহিণী" তিক্ত না হলেও একটু কষায় রসের গল্প, মেমসাহেবের মোহমুগ্ধ বঙ্গসন্তানের মোহমুক্তি যেভাবে ঘটে তাকে বিষবৃক্ষের কমিক রূপ বলে মনে করা যেতে পারে, যদিও সে কৌতুকের পেছনে একটা কঠোর ভর্ৎসনার ছায়া দেখতে পাই।

আরও অনেক রকমের আনন্দ উপভোগের সামগ্রী সংগৃহীত হয়েছে এই ১২৪টি গল্পের সংকলনে। তার মধ্যে একটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই, কেননা সেই গল্পে প্রভাতকুমার যেন এক ঝটকায় তাঁর কালের সমাজের বাধানিষেধ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে দুটি প্রাণবন্ত বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্রকে একেবারে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করবার মতো সান্নিধ্যে হাজির করে দিয়েছেন।

রজনী ও প্রভাবতী, দুই যুবকযুবতী বিয়ের আগে থেকে 'চতুষ্পার্শ্ববর্তী বহু গ্রামের ভিতর দিয়া চক্র-চালনা করিয়া তত্তৎ গ্রামবাসীদের মধ্যে বিপুল বিতর্কের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। বাঙালীর মেয়েকে বাইসিক্লে দেখিয়া বৃদ্ধেরা মন্তব্য করিলেন ঠিক এতদিনে ঘোর কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে।' কলিকালের যতটুকু বাকি ছিল, পরিপূর্ণ হল যখন, 'কলিকাতায় গিয়া বিবাহ হইবে শুনিয়া কিন্তু প্রভা

ও রজনী একটি অভিনব পরামর্শ করিয়া বসিয়াছে। তাহা যেমন অদ্ভুত তেমনই বিপজ্জনক। তাহারা পরামর্শ করিয়াছে ঐ দিন প্রভাতে অন্য সকলের সঙ্গে রেলে কলিকাতায় না গিয়া—দুইজনে একাকী বাইসিক্লে যাত্রা করিবে।'

সেই বাইসাইকেলে যাত্রাই এই গল্প, তাদের যাত্রাপথের মতোই রোদ-ঝলমল, এবং বিকশিত ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে সমৃদ্ধ। আসলে ভালো গল্পে জোরদার প্লটের প্রয়োজন করে না।

প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির অধিকাংশই ক্ষীণকায় কাহিনীর ওপর দাঁড়িয়ে। এমনকী মনে হয়, তাঁর যেসব গল্পে জমজমাট প্লটের প্রাধান্য দেখতে পাই, সেগুলোই গল্প হিসেবে কমজোরি।

তাঁর যেখানে শ্রেষ্ঠত্ব সেখানে সহজ, স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক ভাবে জীবন নিজেকে মেলে ধরেছে এক-একটি নিটোল অনায়াসজাত ছোটোগল্পের রূপে।

বাঙলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্বে চণ্ডীমণ্ডপ

অরবিন্দ সামন্ত

শিল্পায়ন-সংলগ্ন যে নাগরিক জীবন, প্রথম দর্শনের প্রেমে, এর মসৃণতা আমাদের মুগ্ধ করবে। কিন্তু এই মুগ্ধবোধের বিমূঢ়তা অতিক্রম করে আমরা যদি এর অন্তরালবর্তী পরদায় একটু টান দিই, তাহলে একটি দৃষ্টিকটু বৈকল্য আমাদের পীড়া দেবে। এই পীড়াদায়ক বৈকল্যটি হল এর অন্তর্গত সামাজিক বৈষম্য। ফলত আমাদের সাংস্কৃতিক দিগ্‌বলয়ে মোটা দাগের দুটি স্তর লক্ষ করা যাবে। এর একটি স্তর যদি এভারেস্টের উত্তুঙ্গতা হয়, অন্যটি ভূমিস্থ উইঢিবি। একটি ভোগসর্বস্ব কৃত্রিম যন্ত্রসমাজ, অন্যটি দুর্ভোগপীড়িত অকৃত্রিম জনসমাজ। অনেক ভোগের মন্ত্রণায় মুগ্ধ, ফ্ল্যাট-বন্দি, আত্মমগ্ন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে-জীবন, তা নিতান্তই উচ্চকোটির। উচ্চকোটির মানুষের দিনযাপনে যে-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়, তা থেকে ভূমিজ, লোকায়ত, জৈবিক জনজীবনের সাংস্কৃতিক ব্যবধান মেরুপ্রতিম। উচ্চকোটির সংস্কৃতি জীবিকার সঙ্গে লগ্ন নয়; তা মূলত অবসরের বিনোদনসামগ্রী। এই বিনোদনপণ্যের নান্দনিকতা নিয়ে আপনি প্রশ্ন তুলতে পারেন। পক্ষান্তরে, নিম্ন-কোটির গণ-জীবনে সাংস্কৃতিক বোধ প্রাত্যহিক জীবন-যাপনের, দৈনন্দিন রুজিরোজগারের দুঃখ-সুখ থেকে উৎসারিত। নিম্নকোটির লোকসংস্কৃতি জীবনধারণের স্বেদসিক্ত শ্রমের শস্য। তাই তা ক্লেদমুক্ত, মালিন্যহীন, নান্দনিকতায় প্রশ্নাতীত। উচ্চকোটির সংস্কৃতিতে অর্থ উপার্জনের ইন্ধন আছে; কিন্তু নিম্নকোটির সংস্কৃতিতে অর্থমনস্কতার বন্ধন নেই—তা নিত্যকালীন দিনযাপনের সঙ্গে জড়িত। আর যেহেতু লোকসংস্কৃতি জীবনসংগ্রামের প্রতিটি মুহূর্তে তৈরি হয়, তাই দেশ থেকে দেশান্তরে এর কোনো তারতম্য নেই—তা বিশ্বজনীন। কী শিল্পে, কী স্থাপত্য-কৌশলে, কী সংগীতে, নৃত্যে বিশ্বের সমস্ত দেশের লোকসংস্কৃতিতেই একটি মূলগত ঐক্য আছে—তা হল নিরাভরণ সংগ্রাম-মুখরতা। অন্যদিকে, উচ্চকোটির সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির মাত্রার সঙ্গে তুল্যমূল্য; তাই তার ভিন্ন দেশে ভিন্নতর হতে বাধা নেই। উচ্চ-কোটির সংস্কৃতি বিশেষভাবে শ্রেণীবদ্ধ, সীমিত। এর কোনো সর্বজনীন সংলাপ নেই।

মেরুপ্রতিম ব্যবধানে বদ্ধ দুটি সংস্কৃতির মধ্যে নিম্নকোটির সংস্কৃতি বা লোকসংস্কৃতিই আমাদের আলোচনার বিষয়। লোকসমাজ তাদের মাটি বা প্রকৃতির পরিবেশের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট। এই অকৃত্রিম অন্তরঙ্গতা তাদের দীর্ঘকালীন বসবাস বা জীবনধারণের সঙ্গে জড়িত। তাদের মনের শিকড় তাদের পরিবেশের ভূগোলে, তাদের সামাজিক শিকড় তাদের ভূমিজ প্রকৃতির মর্মমূলে। তারা একই ভূখণ্ডে, একই অভ্যাসে লালিত। কারণ লোকসমাজ গোষ্ঠী-বদ্ধতায় সংযুক্ত; উচ্চকোটির কৃত্রিম নাগরিক জীবন থেকে এদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে উচ্চারিত। গোষ্ঠী-বদ্ধতায় লোকসমাজ গড়ে তোলে নানা সামাজিক সংগঠন, যে সংগঠনের সঙ্গে তাদের যোগ আত্মিক, হার্দিক। বাঙলার চণ্ডীমণ্ডপ এমনই একটি সামাজিক সংগঠন।

বাঙলার চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন লক্ষণগুলি ভালোভাবে দেখা যাবে। চণ্ডীমণ্ডপ হল আমাদের গ্রাম্য গোষ্ঠীজীবনের প্রতীকগৃহ। চণ্ডীমণ্ডপ কৌমসংস্কৃতির দেবস্থান, চণ্ডীমণ্ডপ অতিথিশালা,

গ্রাম্য বিবাদের মীমাংসাস্থল—বিচারালয়। চণ্ডীমণ্ডপ গ্রামের সর্বসাধারণের আলোচনাসভা, মজলিশ, আড্ডার ঘর, আবার গুরুমশায়ের পাঠশালা। চণ্ডীমণ্ডপ লোকগীতির আসর, ভাগবত-পাঠের ঠাঁই; পালাগান, কথকতা, কবিগান, পাঁচালিগান, লোকোৎসব, পূজাপার্বণের থান। এক কথায়, বৃহত্তর অর্থে, চণ্ডীমণ্ডপ গ্রামের মানুষের একটি গণতান্ত্রিক ফোরাম।

কিন্তু আজ বাঙলার গ্রামে-গঞ্জে চণ্ডীমণ্ডপ প্রায় নিশ্চিহ্ন। ঘরে-বাইরের বিরুদ্ধ সংস্কৃতির আঘাতে চণ্ডীমণ্ডপের সর্বজনীন রূপটি আজ পরিবর্তিত, বিকৃত। দেশের উচ্চকোটির নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে সংঘাত, বিদেশী শাসকদের ঔপনিবেশিক শোষণের অভিঘাত লোকসংস্কৃতিকে কেন্দ্রচ্যুত করে ফেলেছে। তবুও চণ্ডীমণ্ডপ পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। চণ্ডীমণ্ডপ আছে, অন্য নামে, অন্যভাবে, অন্য ধারণায়। কী সে নাম, কী সে রূপ এ-প্রশ্নটি যেমন জরুরি, তেমনি আরও জরুরি সেই প্রশ্ন অনুসন্ধান করা—চণ্ডীমণ্ডপ কীভাবে অবলুপ্তির পথে চলে গেল। এই প্রশ্নের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত: চণ্ডীমণ্ডপের উদ্ভবই বা কীভাবে হয়েছিল। আজ এই প্রশ্নের উত্তর অনুধাবন করা নিতান্ত জরুরি; কারণ সারা বিশ্বে, কী ধনতান্ত্রিক দেশে, কী সমাজতান্ত্রিক দেশে, গণতন্ত্রের স্থানিক মূল্য নিরূপণে নতুন করে উদ্‌যোগ দেখা যাচ্ছে। বাঙলার চণ্ডীমণ্ডপের মতো একটি সুপ্রাচীন লোকায়ত গণতান্ত্রিক ফোরামের উদ্ভব, ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবিলুপ্তি সম্পর্কে আলোচনা তাই আজ বিশেষভাবে গুরুত্ব অর্জন করেছে। স্বভাবতই আমরা আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ সম্পর্কিত আলোচনাকে কয়েকটি দৃষ্টিকোণে স্থাপন করেছি: (১) চণ্ডীমণ্ডপের বিকাশ, (২) চণ্ডীমণ্ডপের অবলুপ্তি, (৩) চণ্ডীমণ্ডপের পরিবর্তিত রূপ এবং সাম্প্রতিক কালে তার নিহিত সম্ভাবনা।

এক : চণ্ডীমণ্ডপের বিকাশ : মধ্যযুগে চণ্ডীমণ্ডপ

প্রাচীন ভারতে চণ্ডীমণ্ডপীয় ইনসটিটিউশনের আভাস মিললেও "চণ্ডীমণ্ডপ" নামটি ছিল নিরুচ্চারিত। নানা সূত্র থেকে যেসব তথ্য মিলেছে তা থেকে অনুমান করা যায়, "চণ্ডীমণ্ডপ" শব্দবন্ধটি ষোড়শ শতকের চেয়ে পুরনো নয়। মানিকচাঁদের গীতে 'শীতল মন্দিরঘর' কিংবা 'বাঙ্গলা ঘরের' কথা আছে।[১] মাটির ছেঁচা বাঁশের বা কাঠের দেওয়ালের উপর তৈরি কাঠামো বোধ হয় 'বাঙ্গলা ঘর'।[২] কারণ "আইনী আকবরী"তে আবুল ফজল লিখেছেন: 'বাঙলা দেশের ঘরগুলি বাঁশে নির্মিত। কিন্তু খুব বড়োও হয় এবং অনেকদিনস্থায়ী হয়। একখানি ঘরে পাঁচ হাজার টাকা বা আরও বেশি ব্যয় পড়িতে পারে।'[৩] যাই হোক, সেখানে 'মণ্ডপ' বা 'চণ্ডীমণ্ডপ' বলে কিছু নেই। তা ছাড়া ঘর আর মণ্ডপ এক নয়। এমন ঘরের কথা "পূর্ববঙ্গগীতিকা"য় উল্লিখিত আছে। 'ভেলুয়া' নামে গীতিতে বণিকরাজ মুরাই-এর বাড়ির বর্ণনায় 'আটচালা' 'চৌচালা', 'বাঙলা ঘরের' কথা আছে।[৪] কিন্তু মণ্ডপ নেই। মণ্ডপের সন্ধান মিলছে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামে 'নগর চত্বর মাঝে, শিবের মণ্ডপ সাজে, অনাথ মণ্ডপ অতিথিশালা/বাসাড়ে জনের তরে, দীঘল মন্দির করে, প্রবাসী জনের তিথিমেলা।'[৫]

সেকালে নগর কিংবা বর্ধিষ্ণু গ্রামের মাঝখানে শিবমণ্ডপ থাকত। কোথাও-কোথাও ছিল বিষ্ণুমণ্ডপ। পথিকদের সুবিধের জন্যে অতিথিশালাও থাকত গ্রামে। মন্দির, অনাথমণ্ডপ অনেক নগরের শোভা বাড়াতবলে[৬] কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন।[৭] আবার বেশ ব্যয়বহুল চণ্ডীমণ্ডপের কথাও তিনি বলেছেন, 'পাটুলী রাজাদের যে প্রাচীন ভগ্নপ্রায়, ইটের দেওয়াল দেওয়া, চণ্ডীমণ্ডপ ৫০ বছর আগে তিনি দেখেছিলেন তার চালের সাজই 'দু'হাজার টাকা গ্রাস করিতে পারে।'[৭] যাইহোক, যেগ্রামে শিবঠাকুরের জন্য শিবমণ্ডপ, বিষ্ণুর জন্য বিষ্ণুমণ্ডপ, এমনকি অনাথ-

দের জন্য অনাথমণ্ডপ থাকতে পারে, সেগ্রামে চণ্ডীঠাকুরের জন্য চণ্ডীমণ্ডপও থাকবে, এতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। সুতরাং চণ্ডীঠাকুরের যেখানে অবস্থান, সেখানে যদি কোনো চালাওয়ালা মণ্ডপ তৈরি করা হয়, তাহলে তাকে চণ্ডীমণ্ডপ বলা যেতে পারে। আর এইভাবেই চণ্ডীমণ্ডপের উৎপত্তি হয়েছে বলে বিনয় ঘোষ মনে করেন।[৮] কিন্তু শিবমণ্ডপ নয়, বিষ্ণুমণ্ডপ নয়, এমনকী দুর্গামণ্ডপও নয়, চণ্ডীমণ্ডপ নামেরই কেন এত ব্যাপক উচ্চারণ, প্রচলন এবং প্রসার যাতে করে চণ্ডীমণ্ডপ একটি সামাজিক ইনস্টিটিউশনে পরিণত হয়েছে, তা বিনয়বাবু বিশ্লেষণ করেন নি। 'চণ্ডীমণ্ডপ' নাম কেন? এই প্রশ্নের অভ্যন্তরে যে আর্থ-সামাজিক তথা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি লুকিয়ে আছে, তা তাঁর আলোচনায় আড়াল হয়ে পড়েছে। এই অন্তরালবর্তী প্রেক্ষাপটটির উন্মোচন এবং বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

ক. চণ্ডীমণ্ডপ নাম কেন?

আমরা জানি, আর্য প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ভারত-ইতিহাসে বিদ্রোহ হয়েছে বারবার। আর এইসব বিদ্রোহের ঋত্বিক হল নিগৃহীত নিম্নকোটির মানুষরা। আর্য-অনুপ্রবেশের সূচনাপর্বে এইসব বিদ্রোহের প্রকরণ-সংগঠন কীরকম ছিল তা জানার উপায় নেই। তবে বর্ণাশ্রমী ভেদবুদ্ধির সঙ্গে আর্যদের সর্বাত্মক ব্রহ্মবাদ মেলানোর যে স্ববিরোধ, তার বিরুদ্ধে এদেশের আর্য-পূর্ব আদিনিবাসীরা প্রতিবাদ করে নি, এ কথা মনে করা শক্ত। শূদ্ররা তপস্যা করলে তাদের শিরশ্ছেদ হত, যেমন হয়েছিল রামের হাতে শম্বুকের। অস্ত্রবিদ্যা শিখলে আঙুল কাটা যেত, যেমন গিয়েছিল দ্রোণাচার্যের কারসাজিতে একলব্যের। অথচ মজার ব্যাপার হল, গুহক চণ্ডালের ভেলায় ভর দিয়ে নদী পার হতে আটকাবে না পুরুষোত্তম রামের; কিংবা তরুণী ধীবরকন্যা মৎস্যগন্ধাকে দ্বীপে টেনে নিয়ে গিয়ে ভোগ করতে আটকাবে না বেদব্যাস-পিতা পরাশরের। এর বিরুদ্ধে নিম্নকোটির শূদ্ররা যে নীরব ছিল না, তার বহু প্রমাণ আছে। দর্শনের রাজ্যে এই প্রতিবাদের বাণী প্রচার করেছেন মঘোলীপুত্র, গোসাল, কেশ-কম্বলী, আর চার্বাকরা। আর ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে বেদ- ব্রাহ্মণ ও যাগযজ্ঞ-বিরোধী বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে এই বিদ্রোহেরই বৃহত্তর বাস্তবরূপটি প্রকটিত হয়েছে। বুদ্ধ যে সাম্যবাদী ধর্ম প্রচার করেছিলেন তাতে বর্ণাশ্রমিক আভিজাত্য ধ্বংস করে সর্বমানবিক সংহতি স্থাপনই প্রধান লক্ষ্য ছিল। আর, বস্তুবাদী চার্বাক-দর্শন যে বেদোপনিষৎপ্রভাবিত ধর্মপ্রত্যয়ের উপর আঘাত হেনেছিল এবং সমাজে সর্বজনীন কল্যাণাশ্রিত জীবননীতি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, তা-ও এই বিদ্রোহেরই আদিবীজস্বরূপ। বুদ্ধ এই নানামুখে ব্যাপ্ত অসন্তোষ আর বিক্ষিপ্ত বেদনাকেই তাঁর আন্দোলনে সংহত করেছিলেন। তাই ভারত-ইতিহাসে বুদ্ধই হলেন মানুষের প্রথম মুক্তিদাতা, প্রথম বিপ্লবী, আবার প্রথম জনগণমন-অধিনায়কও।[৯] বুদ্ধ সেই শূদ্রদের সমবেত করলেন যারা বিজয়ী আর্যদের সঙ্গে আপস না-করে বনেজঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল; বুদ্ধ সেই শূদ্রদের মর্যাদা দিলেন যারা সামাজিক আর সাংস্কৃতিক জীবনের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে শিক্ষাদীক্ষার উত্তরাধিকারভ্রষ্ট হয়েছিল। বুদ্ধ তাদেরও ঐক্যবদ্ধ করলেন যারা ভারতের আদি শৈব শাক্ত অধিবাসী, যারা আর্য প্রভুত্বের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল দুর্বল বলে, পরিণত হয়েছিল অধিকারভ্রষ্ট শূদ্র দাসে। বুদ্ধ এই পতিত মানবগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন শুধুমাত্র ভারতীয় সমাজ-সংগঠনের কাঠামোটি পুনর্গঠনের জন্য নয়, রাষ্ট্রশাসনেও গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলটি পুনঃস্থাপন করতে। অশোক থেকে হর্ষবর্ধন—হাজার বছরেরও বেশি কাল বহাল ছিল ভারতবর্ষে বৌদ্ধ প্রভুত্ব।

এই প্রভুত্বকে খর্ব করার অপচেষ্টা অবশ্য কম করে নি আর্যভারতের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি। এদেশের সুপ্রাচীন কৌম সমাজবিন্যাস নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা হয়

নি। গারো, কোচ, বাহে, রাজবংশী, সাঁওতালদের সমাজশাসন সম্বন্ধে আমরা মোটামুটি ওয়াকিবহাল, কিন্তু হিন্দু সমাজের নিম্নতর স্তরে যে নানা শাসনগত সংস্কার এখনও সক্রিয়, সেগুলির ঐতিহ্য আজও আমাদের তেমন জানা নেই। তবুও যেটুকু নিশ্চিত করে বলা যায় তা হল—আমাদের গ্রাম্য পঞ্চায়েতি শাসনযন্ত্র প্রাচীন কৌম সমাজেরই দান। পঞ্চায়েত-কর্তৃক নির্বাচিত দলপতিই স্থানীয় কৌম শাসনযন্ত্রের নায়কত্ব করত। সামাজিক দণ্ডের নির্দেশকর্তা ছিল পঞ্চায়েতমণ্ডলী। আলেকজানডারের ভারত আক্রমণ ও অব্যবহিত পরে মৌর্যশাসনের আগেই বাঙলাদেশে কৌমতন্ত্র নিঃসন্দেহে রাজতন্ত্রে বিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।[১০] তবে মৌর্য-সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক বিভাজনের প্রত্যন্ত কাঠামোয় পঞ্চায়েতব্যবস্থা বহাল ছিল—বহাল ছিল তার কৌমগণতান্ত্রিক রূপ। কিন্তু গুপ্তযুগে আবার যখন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ফিরে পেল তার প্রভুত্ব, তখন কৌম পঞ্চায়েতের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যটি তারা সযত্নে লোপাট করে দিল। সন্দেহ নেই, গুপ্ত আমলের পঞ্চকুল বা অষ্টকুল কৌমতান্ত্রিক, কিন্তু এর সুযোগ নিল ব্রাহ্মণেরা, বণিকরা, ব্যবসায়ীরা। ইতিমধ্যেই পুরোহিত, রাজা, শ্রেষ্ঠীরা দলে-দলে বৌদ্ধ ধর্মায়তনে ঢুকে পড়ে সাবোতাজ করেছিল এর অন্তর্গত সাম্যাদর্শ। এদেরই প্ররোচনায় বৌদ্ধধর্মের গণতান্ত্রিক রূপটি বিলীন হল। এসেছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শ্রেষ্ঠীর সাবেকি প্রাধান্য; দেববাদ, অবতারবাদ, অদৃষ্টবাদ আর পুনর্জন্মবাদের পুনরাবির্ভাব। গুপ্তদের আমলে বৌদ্ধধর্ম যখন রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা হারাল, তখন হিন্দুধর্মের পুনরুদ্ধারের নামে এলেন কুমারিল ভট্ট, শংকর। শুরু হল ব্যাপক বৌদ্ধ গণহত্যা। ব্রাহ্মণ্য-বাদীদের নিগ্রহ সইতে না পেরে বেশ কিছু বৌদ্ধ ফিরল হিন্দুধর্মে, আর বেশ কিছু গেল তন্ত্রের পথে, আরও কিছু হল ঘরছাড়া। এই ঘরে-ফেরা হিন্দুদের হাতে বৌদ্ধদের নিরঞ্জন বা ধম্ম হয়ে পড়লেন শিব আর তার পিছু-পিছু হেবজ্র, নীলতারা, বজ্রতারা নানা নামে দেবী কালিকারও পুনর্বাসন হল। পুনর্বাসিত হল আর্যপূর্ব দেবী চণ্ডীও।

চণ্ডীর পুনর্বাসনে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এক বিরাট অভিসন্ধি ছিল। চণ্ডী প্রাক্-আর্য আদিম গ্রামগোষ্ঠীর ভয়-ভক্তির দেবতা। ব্রাহ্মণ্য বিধানে গ্রাম্য দেবতার পূজা নিষিদ্ধ; মনু তো এইসব দেবতার পূজারীদের পতিতই বলেছেন। তবুও চণ্ডীর আর্যীকরণ হল শুধুমাত্র এই বিবেচনায় যে চণ্ডীর সংলগ্ন যে লোকায়ত সংস্কৃতি, তার ধারক-বাহক নিম্নকোটির মানুষদের উপর কর্তৃত্ব করা যাবে। আর্যরা যে কাজটি আর্যপূর্ব মানুষদের উপর বাইরের আঘাতে করতে চেয়েছিল, ব্রাহ্মণরা সেই কাজটি ভেতরের আঘাতে সম্পন্ন করতে চাইল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির লোভ দেবী-চণ্ডীর উপর নয়, তাদের লাভ চণ্ডীর মণ্ডপীয় পরিমণ্ডলে বিধৃত নিম্নকোটির মানুষের গণতান্ত্রিক সংস্কারকে নাশ করায়। তাই ব্রাহ্মণরা বিষ্ণুমণ্ডপের মানুষদের নয়, শিবমণ্ডপের মানুষদেরও নয়, চণ্ডী-মণ্ডপের মানুষদেরই নতুন করে শূদ্র বানাতে চেয়েছিল।

খ. চণ্ডীর প্রাচীনত্বের প্রমাণ

চণ্ডী যে আর্য-পূর্ব দেবী এর অনেক প্রমাণ মিলবে শাস্ত্রে, সনাতন ধর্মাচরণে আর সমাজসংগঠনে। বৈদিক সংহিতায় চণ্ডী-নাম নেই। রামায়ণ-মহাভারত কিংবা কোনো পুরাণেই এই দেবীর উল্লেখমাত্র নেই। প্রাচীন কয়েকটি সংস্কৃত উপ-পুরাণে, যেমন ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ', 'দেবীভাগবত', বৃহদ্ধর্মপুরাণ', 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ', 'হরিবংশ' প্রভৃতিতে চণ্ডীর উল্লেখ আছে। এর থেকে এই নামটি কালক্রমে পূর্ব-ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে প্রবেশ করেছে।[১১] আবার অনেকে মনে করেন, 'চণ্ডী' শব্দটি এসেছে অস্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় ভাষা থেকে। দ্রাবিড়-ভাষাভাষী প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জাতীয় ছোটনাগপুরের অধিবাসী ওরাওঁ উপজাতির মধ্যে "চাণ্ডী" নামে এক শক্তিদেবীর সন্ধান পাওয়া যায়।[১২] চাণ্ডী অবিবাহিত ওরাওঁ যুবকদের শিকারে সফলকাম হবার দেবী। গোলাকৃতি একটি প্রস্তর-খণ্ডে এর পুজো হয় মাঘী পূর্ণিমার দিনে। ওরাওঁদের চাণ্ডীর সঙ্গে বাঙলার লৌকিক চণ্ডীর অনেক মৌলিক সাদৃশ্য আছে। চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু রাঢ়ের অনার্য ব্যাধ যুবক। তার পরাক্রমে পরাজিত ব্যাকুল পশুরা চণ্ডীর শরণাপন্ন হয়েছে। চণ্ডী পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, আর অস্পৃশ্য ব্যাধসমাজই তার অনুগৃহীত। মৃগয়া ও যুদ্ধের দেবী চাণ্ডী নানা রূপ পরিগ্রহণে পটীয়সী। মঙ্গলের চণ্ডীও প্রথমে সুবর্ণগোধিকা, পরে ষোড়শী যুবতীর মূর্তি ধারণ করেছে। শুধুমাত্র ওরাওঁ নয়, ছোটনাগপুরের বিভিন্ন উপজাতি অঞ্চলে অনেক আদিবাসীরই মৃগয়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম চাণ্ডী। যেমন মুণ্ডাভাষী মৃগয়াজীবী বীরহোড় জাতির মৃগয়ার দেবী চাণ্ডী বা চাণ্ডীবোঙ্গা।[১৩] পালামৌ জেলার অস্ট্রিকভাষী করোয়া উপজাতির মধ্যেও চাণ্ডীদেবীর নাম শোনা যায়। ভাষাতাত্ত্বিকরা "চণ্ডী" শব্দটির গঠন দেখেও মনে করেছেন, এটি দ্রাবিড় শ্রেণীর ভাষা। বাঙলার প্রাচীন ছড়ায় চণ্ডীকে 'হাড়ির ঝি' আর "মনসামঙ্গলে" মনসার সহচরী নেতাকে 'ধোপার ঝি' বলা হয়েছে। এ-বঙ্গে অন্ত্যজ হাড়িরা যে আদিম অনার্যভাষী জাতির শাখা থেকে উদ্ভূত, এ-বিষয়ে পণ্ডিতদের দ্বিমত নেই। সুতরাং চণ্ডী যে আর্য-পূর্ব দেবী, এ অনুমান সন্দেহাতীত।

অবশ্য অনেকে আবার মনে করেন যে রাঢ়বঙ্গের চণ্ডী বৌদ্ধ চুণ্ডার নামান্তর মাত্র।[১৪] বৌদ্ধ চুণ্ডাদেবীই দুভাবে আমাদের কাছে পরবর্তী কালে উপস্থাপিত হয়েছে—(১) পৌরাণিক চণ্ডী, (২) লৌকিক চণ্ডী। পৌরাণিক চণ্ডী মার্কণ্ডেয়-পুরাণোক্ত দেবীমাহাত্ম্য অবলম্বনে লিখিত। শূন্যপুরাণ-রচয়িতা ও রাঢ়ের ধর্ম-পূজার প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত মার্কণ্ড মুনির দ্বারা পালিত হয়েছিলেন বলে শূন্যপুরাণে উল্লেখ আছে।[১৫] রাঢ়ে ধর্মঠাকুরের পূজারী মার্কণ্ড মুনি, তাঁর পর রামাই পণ্ডিত, তাঁর পর ধর্মদাস, তাঁরও পর ডোমজাতি-ভুক্ত পণ্ডিতরা। লৌকিক চণ্ডীপূজার ক্ষেত্রেও দেখা যায়—ডোমজাতির মানুষই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করত। মানিক গাঙ্গুলীর ধর্মমঙ্গলেও ডোমজাতীয় মেয়েদের চণ্ডীপূজার কথা আছে। মানিক দত্তের চণ্ডীকাব্যেও দেখা যায়, তিনি শূন্যপুরাণের আদ্যাদেবী ও মঙ্গল-চণ্ডীকে একই দেবতারূপে গ্রহণ করেছেন। বৌদ্ধ ধর্মঠাকুর এবং লৌকিক চণ্ডীপূজায় শূকর বলি দেওয়া হত, মদ্য নিবেদিত হত। শূকরমাংস ও মদ্য বৌদ্ধ-ধর্ম ও সংস্কার-প্রসূত। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের মধ্যে যেসব পুঁথি প্রাচীন, সেগুলিতে বৌদ্ধসংস্কার সুস্পষ্ট বলে অনেকে মনে করেন। পণ্ডিতদের অনুমান, আদিবাসী সমাজ থেকে উদ্ভূত হয়ে চাণ্ডীদেবী কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্মের আচরণিক পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে হিন্দুসমাজে প্রবেশ করে; তারপর বৈদিক দেবী পার্বতী তথা দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যায়।

চাণ্ডীর চণ্ডীতে রূপান্তরে যে আর্যীকরণ হল, তাতে যেমন ব্রাহ্মণদের দুরভিসন্ধি ছিল, তেমনি এর একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসগত সহায়ক প্রেক্ষাপট ছিল। চণ্ডীমঙ্গলের দুটি উপাখ্যানের একটির নায়ক কালকেতু—ব্যাধ। অন্যটির নায়ক ধনপতি—সওদাগর। কালকেতুর গল্পে চণ্ডী বন্যপশুর দেবী। ধনপতির গল্পে চণ্ডী গৃহপালিত পশুর দেবতা। গৃহস্থ দেবী। সভ্যতার দুটি স্তরে একই চণ্ডীর রূপান্তরের ইঙ্গিত এখানে বেশ স্পষ্ট। যাযাবর-নিষাদসভ্যতার স্তর থেকে পশুপালন আর কৃষির স্তরে চণ্ডী রূপান্তরিত হয়েছে। এই রূপান্তরের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, তা-ও ধনপতির গল্পে উচ্চারিত। ধনপতি আর্যসমাজে বর্ণবিধৃত বৈশ্য প্রতিনিধি। তার পরের স্ত্রী খুল্লনা সওদাগরপত্নী হয়েও চণ্ডীপূজার প্রাচীন লোকায়ত ঐতিহ্য ছাড়তে পারে নি। খুল্লনা প্রাগার্যদের ম্যাজিক এবং উইচক্রাফট জানে; কারণ লহনা ধনপতির কাছে নালিশ করেছে: 'তোমার মোহিনী বালা শিখিয়া ডাইনীকলা / নিত্য পুজে ডাকিনী দেবতা।' এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় প্রাগার্যদের মধ্যে, বিশেষত সাঁওতালগোষ্ঠীতে, ডাইনীকলা খুবই

প্রচলিত।[১৬] যাইহোক, ধনপতি লাথি মেরে পূজারত খুল্লনার চণ্ডীর ঘট ভেঙে দিয়েছে। ঘরের মধ্যে ধনপতির সঙ্গে খুল্লনার যে দ্বন্দ্ব, তা আসলে বাইরের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংঘাতের প্রতিচ্ছবি।

এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংঘাতটি একটি বিবর্তিত রাজনৈতিক বলয় থেকে উৎসারিত। প্রত্নতত্ত্ব থেকে একথা স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের কাছাকাছি, ভারতীয় আর্যভাষাভাষী জনগণের আগমনের আগেই, ভারতে উপজাতীয় এবং কৃষক—দু-ধরনের সমাজেরই অস্তিত্ব ছিল। ভাষাতাত্ত্বিক তথ্য থেকে আরও জানা যায় যে, প্রাচীন আর্যভাষাভাষী এদেশীয় জনসাধারণের সংস্পর্শে আসার ফলে উন্নত ধরনের লাঙল-নির্ভর চাষ শুরু করে। আর, ভারতবর্ষে গ্রাম-সমাজের বিবর্তন ঘটেছিল পূর্ববর্তী শিকার-নির্ভর আর পশুপালন-নির্ভর সমাজ থেকে। পূর্ববর্তী উপজাতীয় সমাজে চালু ছিল আদিম কৃষি-পদ্ধতি। এ পদ্ধতি ছিল বন পুড়িয়ে চাষ, আর চাষের জন্য খনন-উপযোগী দণ্ড এবং নিড়ানি। জমি ছিল উপজাতির যৌথ সম্পত্তি। উপজাতীয় সমাজ থেকে কৃষকসমাজের বিবর্তন আসে নিড়ানির বদলে লাঙলের সাহায্যে চাষের মধ্যে দিয়ে। সূচিত হয় সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। লাঙল দিয়ে চাষের জন্য জমি তৈরি করতে গেলে চাই স্থায়ী বসতি। এর ফলে উপজাতি-জীবনে একটি বড়ো পরিবর্তন এল—উপজাতীয় একাত্মবোধ কমে গিয়ে কোনো অঞ্চলের সঙ্গে একাত্মবোধ উদ্ভূত হল। উপজাতীয় একাত্মবোধের পরিবর্তে সামাজিক গোষ্ঠীবিভাগ আরো তাৎপর্যময় হয়ে উঠল। এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য প্রতিফলিত হল খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের উত্তর ভারতে সংঘ বা গণরাজ্যে এবং রাজতন্ত্রের পার্থক্যের মধ্যে। শাক্য, মল্ল, লিচ্ছোবি প্রভৃতি গণরাজ্যে উপজাতীয় কাঠামো বজায় ছিল। এদের রাজনৈতিক কাঠামোয় যে সাম্যলক্ষণ, তা পার্শ্ববর্তী রাজতন্ত্রী কাশী, কোশল, মগধ রাজ্যের চেয়েও বেশি। শাক্যরাজবংশের গৌতমবুদ্ধ তাঁর রাজ্যের গণতান্ত্রিক সাম্যলক্ষণকে বৃহত্তর সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিস্তৃততর করতে চেয়েছিলেন। বৌদ্ধ আন্দোলন আসলে, তাই, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতার ভরকেন্দ্র চণ্ডীমণ্ডপ দখলের আন্দোলন। বৈদিক যুগে এই শক্তির ভরকেন্দ্র সিংহাসনসংলগ্ন হয়ে পড়েছিল। বুদ্ধ সিংহাসন ত্যাগ করে সে ক্ষমতা চণ্ডীমণ্ডপের সমাজে নামিয়ে আনলেন। হাজার বছরের বৌদ্ধ ইতিহাসে মঠ-বিহারের মধ্যে দিয়েও সেই পরিমণ্ডলটি যে বজায় ছিল, তা আমরা আগেই দেখেছি। পরবর্তী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের কালে, ক্ষমতার ভরকেন্দ্রটি আবার সিংহাসনের দিকে ধাবিত হয়। চণ্ডীমণ্ডপের মানুষজন—নিম্নকোটির দাস-শূদ্র-বৌদ্ধ—আবার স্বভূমে ভুঁইছাড়া হল। তারপর আবার যখন মুসলিম শাসকরা এল এদেশে, চণ্ডীমণ্ডপের মানুষরা বাধ্য হয়ে মুসলিম বনে গেল কতকটা আত্মরক্ষায় আশায়, কিন্তু অনেকটাই অত্যাচারী হিন্দুদের অন্তর্ঘাতী সর্বনাশের নেশায়।

এরপর বাঙলাদেশে চৈতন্যের যুগ। ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রের ভিত্তি ছিল জাতপাতের জল-অচল ভেদ। চৈতন্যদেব তা সম্পূর্ণ বিচূর্ণ করলেন। তিনি দূরকে করলেন নিকট, মিলিত করলেন অন্ত্যজ শূদ্রদের অন্তরঙ্গ অনুরাগের বন্ধনে। পূজা-আরাধনার আড়ম্বর নয়, দীনহীনদের সন্ত্রস্ত করজোড়ে দূর-অবস্থান নয়—সকলের জন্যই তাঁর সাদর আমন্ত্রণ, নামসংকীর্তন। নামোচ্চারণেই হবে শ্রেয়োলাভ, মূঢ়, ম্লান, মূক পাবে দুর্লভ অমৃতত্বের অধিকার। মধ্যযুগের ধর্ম ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের ব্যাপারে মুসলিম রাষ্ট্রিক প্রশাসনের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কারণ, স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে পারলেই যদি প্রশাসন নির্বিঘ্নে রাজস্ব আদায় করতে পারে, তাহলে সামাজিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন থাকল কই? কিন্তু সামাজিক শ্রেণীস্বার্থ বিষয়ে প্রশাসন উদাসীন থাকলেও এর গোড়া ধরে

টান দিয়েছিলেন চৈতন্য। ধনী-দরিদ্রের মধ্যে আ-যোজন ব্যবধান, ধনীর প্রমত্ত বিলাস, দরিদ্রের হতচেতন শীতল দিনযাপন, ধর্মের নামে ভণ্ডামি আর পীড়ন চৈতন্যকে ব্যথাদীর্ণ করে তুলেছিল। তিনিও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের মধ্যে পরিবর্ধিত, কিন্তু বুদ্ধের মতোই, তিনিও নেমে এলেন মাটির মানুষের কাছাকাছি। স্রষ্টার কাছে সব সৃষ্টির সমান আকুতির, ঈশ্বরের কাছে জাতিধর্মের বিচার সমান ভ্রূকুটির, এ বিবেচনা চৈতন্যকে বসাল নতুন ধর্মগুরুর আসনেই নয়, সমাজের সনাতন শিরোমণির মর্যাদায়। তাই চৈতন্যের ঐতিহাসিক ভূমিকাটি যতটা না ধার্মিক, তার চেয়ে বেশি সামাজিক।

সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শ নিয়ে বাঙলার সমাজের লৌকিক স্তর থেকে চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্ম উঠে এসেছিল। তাই এটি বাঙলার লোকধর্ম। প্রামাণ্য শাস্ত্রের অনুশাসন নয়, হৃদয়কেই শাস্ত্র বলে স্বীকার ক'রে চৈতন্যধর্ম সর্বধর্মের মূল আদর্শকে গ্রহণ করেছিল। তাই বৃহত্তর পরিধিতে বাঙলার লোকসমাজ সেদিন গড়ে উঠবার অবকাশ পেয়েছিল। এইভাবে সমাজশাসনের ভরকেন্দ্রটি আবার ফিরে এল চণ্ডীমণ্ডপীয় পরিমণ্ডলে—নিম্নবর্গীয় গণতান্ত্রিক আধিপত্যে।

চৈতন্যবোধে যারা লালিত হল তারা দীননন্ধু চৈতন্যকে দিল ঈশ্বরের সম্মান। বাঙলাদেশ প্লাবিত হল চৈতন্যজীবনীসাহিত্যে। 'কানু বিনা গীত নাই'—একথা যে বাঙলাদেশের ক্ষেত্রে সত্যি, তা আমরা জানি; কিন্তু পশ্চিমসীমান্ত বাঙলার অর্ধ-আদিবাসী-অধ্যুষিত পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চলে হাজার-হাজার ঝুমুরগানে যেমন রাধাকৃষ্ণেরই নাম আর লীলাকাহিনী, তেমন পূর্ববাঙলার মুসলমানগরিষ্ঠ অঞ্চলের লোকসংগীতেও রাধাকৃষ্ণপ্রেমসংগীত ছাড়া গান নেই, একথা না মেনে উপায় কী? এর কারণ, চৈতন্যভাবধারা সমাজমানসকে নাড়িয়েছিল সমূলে, সবেগে; না হলে বাঙলা আর উড়িষ্যার সাধারণ জনসমাজ এত ব্যাপকভাবে তা গ্রহণ করতে অগ্রসর হত না।

লোকায়ত জীবনবোধের যে উন্মীলন চৈতন্যকালে হয়েছিল, সেই ধারার শেষ সঙ্গীত শোনা গেল মঙ্গলকাব্যে। মঙ্গলের নায়করা কেউই দেবতা বা অবতার নয়। সাধারণ মানুষ, কখনও বা নিম্নবর্গের মানুষ। ভাব আর উদ্দেশ্যের দিক থেকে মঙ্গলের কাহিনী বিশেষ কোনো দেবতার মাহাত্ম্যপ্রচার ঠিকই, কিন্তু মঙ্গলের কবিরা এর মধ্যে দিয়েই সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষটির—বিশেষত নিম্নবর্গের মানুষটির চরিত্রমহিমা প্রচার করেছেন। চণ্ডীমঙ্গলের অনার্য ব্যাধ-দম্পতি, ধর্মমঙ্গলের ডোম-ডোমনী, কালু, লখাই এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। এক চাঁদ সওদাগর ছাড়া—ধনপতি চাঁদ সওদাগরের ছায়ায় পরিকল্পিত একথা মেনে নিলে—আর কোনো অভিজাত জাতির চরিত্রের মহিমা-প্রচার মঙ্গলে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া, মঙ্গলের দেবতারা কেউই বৈদিক হিন্দুধর্মের কল্পনার স্বর্গবিহারী নন। তারা মূর্তিমান, মানবীয়। নিত্য, লৌকিক ক্রিয়াকর্মে অভ্যস্ত (শিবমঙ্গলে শিব চাষবাসের জন্যে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে তাঁর হাতের ত্রিশূল ভাঙিয়ে জোয়াল, কোদাল, ফাল ইত্যাদি চাষের যন্ত্র বানাচ্ছেন) দেবতারা মর্ত্যের মানুষদের সঙ্গে মিলেছেন। আরও লক্ষ করার বিষয়, মঙ্গলের দেবতারা স্বর্গীয় দেবতাদের শ্রেণীগত ক্রমবিন্যাসে নিম্নকোটির দেবদেবী। নিম্নকোটির মানবিক চরিত্রকে নিম্নকোটির দৈবিক চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়েছেন মঙ্গলের কবিরা। মঙ্গলের অন্যান্য নিম্নকোটির দেবদেবীর মতো চণ্ডীও বঙ্গসমাজে প্রবেশ করেছে মধ্যযুগীয় নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতির গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডলের ঐতিহাসিক সূচনাসূত্রে।

গ. চণ্ডীর হিন্দুসমাজে আগমন

এখন প্রশ্ন হল, কবে থেকে এবং কীভাবে আর্যপূর্ব দেবতা চণ্ডী সাধারণ হিন্দুসমাজে পূজ্য চণ্ডী হিসেবে গ্রাহ্য হল? এ প্রশ্ন জরুরি, কারণ এর থেকেই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যাবে আক্ষরিক 'চণ্ডীমণ্ডপের' সূচনাপর্ব।

এ প্রশ্ন জরুরি, কারণ এর থেকেই লক্ষ করা যাবে চণ্ডীকে আর্যীকরণ করার ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দুরভিসন্ধি। এজাতীয় প্রশ্নের দু ধরনের প্রমাণের আলোচনা করেছেন আশুতোষ ভট্টাচার্য এবং বিনয় ঘোষ।[২৭] প্রথমত, সাহিত্যিক প্রমাণ। দ্বিতীয়ত, শিল্পকলার নিদর্শন বা ভাস্কর্যের প্রমাণ। এর সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের তৃতীয় মাত্রা আমরা যোগ করতে চাই। এই তৃতীয় মাত্রাটি আর্থ-সামাজিক ইতিহাসের প্রেক্ষাপট। প্রথমে সাহিত্যিক সাক্ষ্যের উল্লেখ করি। চৈতন্যের সমসাময়িক কবি বৃন্দাবন দাস সমসাময়িক নবদ্বীপের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন : 'ধর্ম কর্ম লোকে সবে এই মাত্র জানে/মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।'[২৮] বৃন্দাবন অন্যত্র বলেছেন, পাতকী জগাই মাধাই একদিন 'প্রভুরে দেখিয়া বলে নিমাই পণ্ডিত/করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত।'[২৯] মঙ্গলচণ্ডীর গীতের কথা বলেও কবি অন্যত্র বলেছেন : 'মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে ঘরে ঘরে/দুর্গোৎসবকালে বাদ্য বাজাবার তরে।' সুতরাং ষোড়শ শতকে মঙ্গলচণ্ডীর গান যে বেশ জনপ্রিয় আর বহুপ্রচল তা বোঝা যায়। তাই এর সূত্রপাত যদি আরও দু শো বছর আগে হয়ে থাকে বলে অনুমান করা হয়, তাহলেও ভুল হবে না। কারণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবীভাগবত ইত্যাদিতে মঙ্গলচণ্ডীর সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে ; আর এগুলি, অনুমিত হয়, লেখা হয়েছিল ত্রয়োদশ শতকে। সুতরাং চৈতন্যের আগেই মঙ্গলচণ্ডীগানের প্রচলন হয়েছিল। রাত জেগে মঙ্গলচণ্ডীর গীত শোনা হত। অনুমান করা শক্ত নয়, এর জন্য চণ্ডীমণ্ডপও ছিল। মনে হয়, চণ্ডীমণ্ডপে চণ্ডীরই আস্থান, প্রধানত মঙ্গলচণ্ডীর গীত-উৎসবের জন্যই তার সৃষ্টি। পরে, চণ্ডীই যদি দুর্গা হয়ে থাকেন তাহলে চণ্ডীমণ্ডপই ধীরে-ধীরে দুর্গোৎসবের মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়। কারণ, পুরাণে বলা হয়েছে, এই মঙ্গলচণ্ডী 'মূর্তিভেদেন সা দুর্গা।' পণ্ডিতরা অনুমান করেছেন—মৃন্ময়ী দুর্গাপূজার প্রচলন বেশি দিনের পুরনো নয়। আনন্দনাথ রায় জানিয়েছেন ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বাঙলাদেশে সর্বপ্রথম শারদীয় ও বাসন্তী দুর্গোৎসবের প্রচলন হয়।[২০] রাজশাহীর তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ রমেশ শাস্ত্রীর পরামর্শে সাড়ে আট লক্ষ টাকা ব্যয় করে শারদীয় দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা করেন। কংসনারায়ণকে টেক্কা দেওয়ার জন্য ভাদুড়িয়ার জগৎনারায়ণ বাসন্তী দুর্গোৎসবে ব্যয় করেন ন লাখ টাকা। এর পর থেকেই, অনেকের অনুমান, হিন্দু জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্গোৎসব আর বাসন্তীপূজার বহুল প্রচলন শুরু হয়ে যায়। মনে হয়, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের আগে বাঙলায় দুর্গাপূজার প্রচলন হয় নি। কিন্তু দশম থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যেই হিন্দুসমাজে চণ্ডীপূজার সাধারণ প্রচলন হয়। তারপর পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে বাঙলায় চণ্ডীমণ্ডপ দুর্গোৎসবের মিলন-মন্দির হয়ে ওঠে।

প্রাচীন চণ্ডীই যে বর্তমানের দুর্গা, এ অনুমানের পিছনে দুই দেবী সম্বন্ধে ভক্তমানসে কতকগুলি প্রার্থনার মৌলিক সাদৃশ্য বিবেচনা করা যেতে পারে। দেবী দুর্গার কাছে, সাধারণ হিন্দুমানসে এমন কোনো প্রার্থনা নেই যা আমরা করি না। দেবী 'শক্তিভূতে সনাতনি।' তিনি 'গুণাশ্রয়ে গুণময়ি।' তাই লৌকিক সমস্ত কামনা-বাসনা-প্রার্থনা তাঁর কাছে করা যায়। দুর্গার পরিচয়ও তাই ভক্তমানসে বিবিধ—নারায়ণী, ঈশানী, বিষ্ণুমায়া, শিবা, সতী, নিত্যা, সত্যা, ভগবতী, সর্বাণী, সর্বমঙ্গলা, অম্বিকা, বৈষ্ণবী, গৌরী, পার্বতী, সনাতনী। লৌকিক চণ্ডী সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। তাঁরও পরিচয় বিভিন্ন—নাটাইচণ্ডী, ঘোরচণ্ডী, উড়নচণ্ডী, কুলুইচণ্ডী, শুভচণ্ডী, রথাইচণ্ডী, উদ্ধারচণ্ডী, রণচণ্ডী, এলাইচণ্ডী, বসনচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী, অবাকচণ্ডী। কিংবা মঙ্গলচণ্ডী, জয়মঙ্গলচণ্ডী হরিযমঙ্গলচণ্ডী, সংকটমঙ্গলচণ্ডী, উদয়মঙ্গলচণ্ডী ইত্যাদি। চণ্ডীর প্রকৃতি ভীষণা, তার কাছে অমঙ্গলের আশঙ্কাই বেশি। তাই তাঁকে প্রসন্ন রাখতে তাঁর প্রবৃত্তির বিপরীতার্থক শব্দ দ্বারা তাঁর উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে ইউফেমিশম, তার আশ্রয় নেওয়া হয়।

ঠিক একইভাবে গরমকালে বসন্ত হলে গ্রামের লোক লৌকিক শীতলা দেবীর শরণ নেয়। মোট কথা, লোকমানসে যাবতীয় দুঃখবেদনা, সুখসান্ত্বনা সবকিছুর উৎস বা লয় সবই চণ্ডীকেন্দ্রিক। তাই চণ্ডীর ব্রাহ্মণ্যীকরণ করতে পারলে আধিপত্যের জালটি বহুদূর বিস্তৃত করা যাবে।

শিল্পকলার নিদর্শন থেকেও চণ্ডীর লৌকিক বিশেষত্ব প্রমাণ করা যায়। বাঙলার চণ্ডীমণ্ডপের স্থাপত্যকৌশল সম্বন্ধে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবরণে জানতে পারি : '১১৭২ সালের নির্মিত পাকা চণ্ডীমণ্ডপের বারন্দায় কড়ির প্রান্তে ক্ষোদিত হাতি-শুঁড় ও বাঘের মুখ' আছে। প্রায় দু শ বছর আগের মাটির চণ্ডীমণ্ডপের চারটি কাঁঠালের খুঁটিতে তিনি ৫০ বছর আগে দেখেছেন 'অদ্ভুত কারুকার্য করা' করা।[২১] কুমুদনাথ মল্লিক লিখেছেন : 'উৎসবমণ্ডপ দেবদারু পাতায় কদলীবৃক্ষে পূর্ণকুম্ভে "রচনা"র ফলে সুসজ্জিত হইত। কাঁদিসমেত রম্ভা, কাঁদিসমেত ডাব, শাখাসহিত বাতাবী লেবু ও অন্য ফল পূজাগৃহে ঝুলাইয়া দেওয়া হইত। উহারই নাম "রচনা"। চণ্ডীমণ্ডপ নানারূপে বিচিত্রিত আলিপনায় চিত্রিত করা হইত। রাত্রে সর্ষপ ও রেড়ীর তেলের তরবেতর আলোক দেওয়া হইত।'[২২] বাঙলার চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে, গৌরীহর মিত্র জানিয়েছেন, 'শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব বিলুপ্ত হইত। কেননা, এইখানেই শ্রীমদ্ভাগবতের কথকতা, শ্রীকৃষ্ণের লীলা বা রাসকীর্তন, চৈতন্যমঙ্গলের গান, চণ্ডীমঙ্গলের গাথা, ধর্মরাজের মাহাত্ম্য, মনসামঙ্গলের গান প্রভৃতি সমভাবেই অনুষ্ঠিত হইত। আবার এই চণ্ডীমণ্ডপে সর্বসাধারণের বৈঠকে গ্রামের মণ্ডল ও প্রধান-প্রধান ব্যক্তিগণ সকলে সমবেতভাবে গ্রাম্য অপরাধের বিচার করিত।'[২৩]

বাঙলার চণ্ডীমণ্ডপের স্থাপত্যকৌশল, সজ্জাবিন্যাস ও ব্যবহারিক যে বিশেষত্ব লক্ষ করা গেল তার সঙ্গে, পণ্ডিতরা বলেন, বিহার, উড়িষ্যা, ছোটোনাগপুরের অস্ট্রিক- ও দ্রাবিড় -ভাষাভাষী প্রাগার্য ওরাঁও, মুণ্ডা, হো, খাসিয়া, বিড়হোড়, জুয়াঙ, ভুঁইঞা জাতির গ্রাম্য সাধারণ গৃহ ধুমকুড়িয়া বা গীতিওড়-এর সাদৃশ্য আছে।[২৪] শুধু বিহার-উড়িষ্যায় নয়, মধ্যপ্রদেশের মারিয়াদের, ত্রিবাঙ্কুরের মুথুবন, মান্নান ও পালিয়ান গ্রামে, আসামের ইন্দো-মোঙ্গল জাতি নাগাদের মোরং ও গারোদের নোকপান্তে এই ধরনের কমিউনিটি হল দেখা যায়। উভয়ের ব্যবহারিক বিশেষত্বের সাদৃশ্য ছাড়াও গঠন-পারিপাট্যের সাদৃশ্য লক্ষ করার মতো।

তা ছাড়া, আমরা জানি, উর্বরতাবাদ পৃথিবীর যে-কোনো আদিম মানবগোষ্ঠীরই আচরণসিদ্ধ সংস্কার। রাঢ়বঙ্গের দুর্গাপূজার মধ্যেও এই উর্বরতাবাদের সংস্কার বেশ স্পষ্ট করে লক্ষ করা যাবে। রাঢ়ের দুর্গাপূজার শুরুতেই নবপত্রিকা বা কলাবউয়ের কথা আসে। কলাবউয়ের নির্মাণবৈশিষ্ট্য লক্ষ করলে দেখা যাবে : এতে লাগে রম্ভা, ডালিম, ধান, হলুদ, মান, গুড়িকচু, বেল, অশোক, জয়ন্তী—এই নটি গাছের পাতা।[২৫] এই ডাল বা পাতাগুলিকে একত্র করে শ্বেত-অপরাজিতার লতা দিয়ে এমনভাবে বাঁধা হয় যাতে জোড়াবেল উপরের দিকে পাশাপাশি থাকে, আর অপরাজিতা লতার ফুলসহ একটি প্রান্ত নীচের দিকে থাকে। তন্ত্রের পুঁথিতে অপরাজিতা যোনিপুষ্প বলে মান্য। উপরের জোড়া বেল দেবীর স্তনযুগলের প্রতীক। রাঢ়ের দুর্গাপূজায় চাঁড়ালঘর থেকে আনা অন্তত একটি ছোটো পানিফল এবং পদ্মও যোনির প্রতীক রূপে গৃহীত হয়েছে। পূজায় এবং মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্মে ব্যবহৃত প্রদীপের আকারও যোনিসদৃশ। প্রদীপের সলতে প্রদীপের মধ্যে পুড়ে গেলে রাঢ়ের মেয়েরা মনে করে 'গর্ভ পুড়ে গেল'। পূজামণ্ডপের দ্বারের দু ধারে যে কদলীকাণ্ড ও জলপূর্ণ ঘট দেওয়া হয় তা-ও তাৎপর্যপূর্ণ। কদলীকাণ্ড দুটি দেবীর দুই পাদ আর জলপূর্ণ কুম্ভ দুটি দেবীর নিতম্বের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। সবকিছু মিলে, এইভাবে রাঢ়ের দুর্গাপূজায় এক যোনিরূপা মাতৃকার পূজা ও উর্বরতাবাদের চরম অভিব্যক্তি পরিকল্পিত হয়েছে। এসবই প্রাগার্য কৌম

সংস্কৃতির লক্ষণাক্রান্ত। পরবর্তী কালে, বৌদ্ধতন্ত্রেও, দেবদেবীপরিকল্পনায় এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যাবে। আদিবুদ্ধ, পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ইত্যাদি বৌদ্ধ দেবতাদের নিজ-নিজ শক্তির (সহচরীর) সঙ্গে আলিঙ্গনবদ্ধ, এমনকি যোনিবদ্ধ মুদ্রায় দেখা যাবে শান্তিদেবের সময়ে (৬৯৫-৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ) প্রচলিত বৌদ্ধতন্ত্রের যুগে।[২৬] স্বভাবতই অনুমান করা শক্ত নয় যে রাঢ়ের আদিবাসী ও অনুন্নত জাতিগোষ্ঠীর মানুষের জীবনচর্চা অনেকটা তন্ত্রের আওতায় বিকশিত হয়েছে। কিংবা প্রচলিত আদিবাসী জনজীবন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মকে প্রভাবিত করেছে। দ্বিতীয় অনুমানটিই অধিকতর গ্রাহ্য এই কারণে যে আদি বৌদ্ধধর্মে অবতার- বা দেবদেবী-কল্পনা ছিল না। বুদ্ধের মৃত্যুর পরে, কৌমবিধৃত নিম্নকোটির মানুষদের দেববাদ, বুদ্ধকে অবতারে রূপান্তরিত করার মধ্যে প্রকাশের আকুতি খোঁজে। আর এর সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেছিল পরবর্তী ব্রাহ্মণ্যধর্মবেত্তারা। তাই বুদ্ধের নামে আর্যপূর্ব বহু দেবদেবী রূপান্তরিত কলেবরে পুনর্বাসিত হল। আর এইভাবেই রাঢ়বঙ্গের হিন্দুসমাজে চণ্ডীর পূজাপ্রকল্প, গঠনকৌশল আর মণ্ডপসজ্জায় আদিম উর্বরতাবাদ ও বৌদ্ধিক ভাব, প্রতীক আর দর্শন প্রবলভাবে উচ্চারিত হল। আরও পরবর্তী কালে, চৈতন্যযুগে যে এই লোকায়ত সাংস্কৃতিক সত্য নতুন করে রাঢ়বঙ্গকে প্লাবিত করেছিল তা আমরা দেখেছি; আর আচরণধর্মী বৈষ্ণবদের নামসংকীর্তনের মৃদঙ্গ যে আদিজনজীবনের লোকবাদ্য মাদলের রূপান্তর, তা-ও গবেষকরা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।[২৭]

চাণ্ডী বা চাণ্ডীবোঙ্গার চণ্ডীতে রূপান্তরের ইতিহাসে সাহিত্য ও শিল্পকলার সাক্ষ্য ছাড়াও ইতিহাসবিধৃত সাক্ষ্যও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের নৃতাত্ত্বিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি নিয়ে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয়েছে।[২৮] কিন্তু এর অর্থনৈতিক পটভূমিটি তেমন করে উন্মোচিত হয় নি।[২৯] বস্তুত এই পটভূমির পিছনে তিনটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য স্মরণ করার মতো। প্রথমত, রাঢ় লোহা আর তামার মতো দরকারি ধাতুর উৎস। দ্বিতীয়ত, ঐতিহাসিক যুগে অনুর্বর জঙ্গলময় রাঢ়ভূমি চারদিক থেকেই স্থায়ী বসতিপূর্ণ উর্বর ভূমির দ্বারা পরিবেষ্টিত। তৃতীয়ত, ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এবং তার পরেও রাঢ়, বাঙলার গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অন্যতম প্রধান প্রবেশপথ ছিল। পশ্চিমে উত্তর ভারত থেকে এবং দক্ষিণে উড়িষ্যা হয়ে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে রাঢ়ের মধ্যে দিয়েই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের যোগাযোগ হত, কী রাজনৈতিক অধিকার বিস্তারের প্রশ্নে, কী বাণিজ্য বিস্তারে, এমনকী সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের ব্যাপারেও। আর ব-দ্বীপ অঞ্চলের উৎপাদন ও সমাজব্যবস্থা সচল রাখতে, লোহা ও তামার মতো অত্যাবশ্যকীয় ধাতুর উৎসভূমি রাঢ়ে, সব সময়েই অনুপ্রবেশ ঘটত। সেই কারণেই বনময়, অনুর্বর রাঢ়ের ভূখণ্ডে আর্যসংস্থিতির বাহক, স্থায়ীবসতিসম্পন্ন হিন্দুসমাজের অনুপ্রবেশ শুরু হয়। আর এই অর্থনৈতিক স্বার্থকে পুরোপুরি স্বচ্ছল কায়েম করতে সাংস্কৃতিক অভিযানও সূচিত হল। এই সূত্রেই হিন্দুসমাজব্যবস্থা এবং আর্য ধর্মীয় সাংস্কৃতিক প্রভাব দিয়ে রাঢ় অঞ্চলকে নিয়ন্ত্রণ করার আগ্রহ বেড়ে গেল। এই অনুমানের সত্যতাতে বেগলারের বাঙলার পুরাকীর্তির বিবরণ সাক্ষ্য দেবে। বেগলার দেখিয়েছেন, কীভাবে রাঢ়ের পুরাকীর্তির কেন্দ্রগুলি প্রাচীন বাণিজ্যপথের ধারে-ধারে গড়ে উঠেছিল।[৩০] বারাণসী আর পাটলিপুত্রের পথ দুটি যুক্ত ছিল বাঙলার ব-দ্বীপ অঞ্চলের বাণিজ্যকেন্দ্র ও বন্দরগুলির সঙ্গে। তাই তাম্রলিপ্তের মতো দক্ষিণ বাঙলার বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগের প্রশ্নে রাঢ়ের বাণিজ্যপথের গুরুত্ব অস্বীকার করা যাবে কী? বীরভূম থেকে ময়ূরভঞ্জ পর্যন্ত কঙ্করময় বনভূমির সর্বত্রই পুরাকীর্তি ঘনসংবদ্ধ। দূরপ্রসারী বাণিজ্যপথের ধারে-ধারে এত নাগর মন্দির, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য প্রতিমার মধ্যে যে আর্থিক সমৃদ্ধির আভাস আছে, সেটি রাঢ়ের স্থানীয় জনজীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন, একথাও বা মনে করা যাবে কী করে! সুতরাং মানতেই হয়, রাঢ়ের কৌম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে স্থায়ীবসতিসম্পন্ন সমাজের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেন প্রগাঢ় হয়েছিল। শুধুমাত্র নবম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বাঙলার নাগর মন্দিরের গঠনপরিকল্পনা আর রূপকল্পনা দেখলেই বোঝা যাবে যে, তা রাঢ়ের রাগ বা কোড়-দেওয়া খড়ের চালের টানা রেখা, আদিবাসী চিত্রকলার স্বচ্ছন্দ দীর্ঘায়ত বিস্তার এবং আদিবাসী নৃত্য-গীতের জড়তাহীন গতিময়তা থেকে উৎসারিত।

এখন প্রশ্ন হল—হিন্দুসমাজের সঙ্গে প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর যে সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ, তাতে আদিবাসী কৌম-জনগোষ্ঠীর সদিচ্ছা বড়ো, না-কি বড়ো হিন্দুসমাজের নিজস্ব গরজ? এ কথা ঠিক যে, হিন্দুসমাজের প্রান্তবর্তী কৌম-জনগোষ্ঠী হিন্দু সাংস্কৃতিক উপাদান সরাসরি অনেক নিয়েছে; কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, এই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রক্রিয়ায়, প্রান্তবর্তী জনগোষ্ঠীর দিক থেকে প্রতিরোধের দৃষ্টান্তও আমাদের চোখে পড়েছে। পারাগ্রাম (পুরুলিয়া জেলা) থেকে রংকিনী দেবীর ধলভূমে আগমন আর প্রতিষ্ঠালাভের কাহিনীর মধ্যে হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে আদিবাসী কৌম সংস্কৃতির বিরোধের আভাস সুস্পষ্ট।[৩১] হিন্দুসমাজ আর সংস্কৃতি যেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত সেখানে বিরোধের ফলে আদিবাসী কৌম সংস্কৃতি পশ্চাদপসরণ করেছে। রংকিনী পারা ছেড়ে চলে এসেছেন ধলভূমে। কিন্তু চাণ্ডী আর ফেরেন নি; তিনি চণ্ডী হিসেবে হিন্দুসমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন? কারণ, রংকিনীর সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিসরটি তত বড়ো নয়, যতটা চাণ্ডীর। চাণ্ডীর আর্যীকরণ করতে পারলে চাণ্ডীবিধৃত যে বৃহৎ সাংস্কৃতিক পরিসর, তার মানুষজনকেও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। চাণ্ডী পশুকুলের দেবতা, চাণ্ডী মৃগয়ায় সফল হবার দেবতা। মৃগয়া, পশুপালন এবং কৃষিকর্ম কৌম জনজীবনের অর্থনৈতিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্বে লক্ষ করা গেছে। সুতরাং তাদের জীবন-জগৎ চাণ্ডীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। উপরন্তু এই আবর্তনের কালাতিক্রমণে চাণ্ডী গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে গোষ্ঠীজীবনে। এই গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে হিন্দুসমাজের চাণ্ডীকে চাই-ই। আবার, হিন্দুসমাজে দুর্গা শুধুমাত্র সর্ববিধ মনস্কামনা পূর্ণ করার দেবী নন। দুর্গাকে কেন্দ্র করে হিন্দুসমাজে একটি গণতান্ত্রিক, সাংস্কৃতিক বাতাবরণ সৃষ্ট হয়েছে। সুতরাং চাণ্ডীকে চণ্ডীতে উন্নীত করাতে পারলে এবং তা কালক্রমে দুর্গার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারলে প্রাক্-আর্য নিম্নকোটিদের আর্যীকরণের প্রলোভনও দেখানো যায়, নিম্নকোটির গণজীবনকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণও করা যায়। এইভাবেই দুর্গামণ্ডপ নয়, চণ্ডীমণ্ডপই বাঙলার লোকজীবনে যথার্থ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের গুরুত্ব পেয়েছে।

[বাকি অংশ আগামী সংখ্যায়

সূত্রনির্দেশিকা

১. মানিকচাঁদের গীতে উদুনী বানার মুখে বলানো হয়েছে—'কার লাগি বান্দিলাম শীতল মন্দির ঘর / বান্দিলাম বাঙ্গলা ঘর নাহি পড়ে কালী।' মা: গী: পৃ ৯৩।
২. মধ্যযুগের বাংলা: কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৩৩০, পৃ ৩৫৭।
৩. পূর্বোক্ত গ্রন্থ: পৃ ৩৫৭-৫৮।
৪. 'বড় বড় ঘর, তার আটচালা চৌচালা / আর সোনা দিয়ে মুড়াইছে মাথা রে।/ ··· হাজার বাণিজ্য নায় / সাগর বহিয়া যায় / দেখিতে অতি চমৎকার রে।' বিনয় ঘোষের 'বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব' গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ ১৪৬-৪৭।
৫. ওই পৃ ১৪৭।
৬. পূর্বোক্ত গ্রন্থ: পৃ ২৪৯।
৭. ওই পৃ ৩৫৩।
৮. পূর্বোক্ত গ্রন্থ: পৃ ১৪৭।
৯. এই ভাবনাটি পর্বে-পর্বে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত তাঁর 'বস্তুবাদীর ভারতজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে। কলকাতা, ১৯৮২। পৃ ৩০-৩১, ৩৬-৪০।

১০. নীহাররঞ্জন রায় : 'বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব' ১৩৭৩। কলকাতা। পৃ ৯৯।
১১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' কলকাতা। ১৯৭৫, পৃ ৪৩৩।
১২. S. C. Roy : *Oraon Religion and Customs*, Ranchi, 1928. pp. 60-65.
১৩. S. C. Roy : *The Birhors*, Ranchi, 1925. pp. 3, 298-99, 50.
১৪. মানিকলাল সিংহ : 'রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি', তৃতীয় খণ্ড। পৃ ৭৬।
১৫. এ প্রসঙ্গে মানিক রায় গাঙ্গুলীর 'ধর্মমঙ্গল', পৃ ২০, ও শূন্যপুরাণ পৃ ১২১, ১৭০ ও ২১১ দ্রষ্টব্য।
১৬. উৎসাহী পাঠকরা C. H. Bompast-এর *Folklore of the Santal Parganas* কিংবা W. G. Acher-এর প্রবন্ধ '*The Santal Treatment of Witchcraft*', *Man in India*. Vol. XXVII, June 1947. No. 2, pp 104-123 দেখে নিতে পারেন।
১৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪৫১-৫৮। বিনয় ঘোষ : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৫১-৫৭।
১৮. বৃন্দাবন দাস : 'চৈতন্যভাগবত'। ১/২।
১৯. ওই, ২/১৩।
২০. "বারভূঞা বা ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাস"। আনন্দনাথ রায়।
২১. প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ৩৫৫-৫৮।
২২. "নদীয়াকাহিনী"। বিনয় ঘোষের প্রাগুক্ত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ ১৫৫।
২৩. "বীরভূমের ইতিহাস"। বিনয় ঘোষের পূর্বোক্ত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য, পৃ ১৫৪।
২৪. এটি বিনয় ঘোষের অভিমত। প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৫৩।
২৫. মানিকলাল সিংহ : "রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি, প্রথম খণ্ড"। পৃ VIII-XII.
২৬. Binoytosh Bhattacharyya : *The Indian Buddist Iconography*. p 43.
২৭. এ বিষয়ে ভাল আলোচনা করেছেন সনৎকুমার মিত্র তাঁর বাঙলার লোকবাদ্য গ্রন্থে।
২৮. এ-প্রসঙ্গে প্রামাণ্য গ্রন্থ : E. T. Delton, *Descriptive Ethnology of Bengal*, Calcutta, 1872 , I. D. Beglar, 'A Tour Through the Bengal Province', in '*Report of the Archaelogical Survey of India*, 1872-73, Vol—VIII, Calcutta, 1878 , H. H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal*, Vol - I, II. London, 1891 ; Saratchandra Roy, *The Mundas and their Country*, Calcutta, 1912 ; Nirmal Kumar Bose, *Culture and Society in India*, Bombay, 1967.
২৯. এ বিষয়ে সম্প্রতি আলোচনা করেছেন সদ্যঃপ্রয়াত হিতেশরঞ্জন সান্যাল তাঁর "রাঢ়ের ইতিহাস প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে। "অনুষ্টুপ" শারদীয়, ১৩৯৬, পৃ ২-২৬।
৩০. I.D. Beglar, 'A Tour through the Bengal Province', *Report of the Archoelogical Survey of India*, 1872 73, Vol—VIII, Calcutta, 1878.
৩১. রংকিনীর পাবা ছেড়ে ধলভূমে চলে আসার কারণ হিসেবে যে লোককথা প্রচলিত আছে তা হিতেশরঞ্জন সান্যাল আলোচনা করেছেন পূর্বোক্ত প্রবন্ধে।

মতামত

১

প্রসঙ্গ এস. ওয়াজেদ আলি

সেই কবে ক্লাসের বইতে পড়েছিলাম এস. ওয়াজেদ আলির "ভারতবর্ষ"। তা সে লেখাটা পড়ার পর মনে একটা গভীর দাগ রেখে গিয়েছে, যা এখনো ভুলতে পারি না। মার্চ সংখ্যা চতুরঙ্গে শ্রদ্ধেয় অলোক রায়ের "জন্মশতবর্ষে এস. ওয়াজেদ আলি" লেখাটি পড়লাম। পড়ে খুব কষ্ট লাগল। আমার মনে গেঁথে যাওয়া ওয়াজেদ আলি, আর বর্তমান লেখার ওয়াজেদ আলি যেন সম্পূর্ণ আলাদা। সে লেখা পড়ে ওয়াজেদ আলি সম্পর্কে যে ধারণা জন্মেছিল, তা যেন বর্তমান রচনা পড়ে খানখান হয়ে গেছে। বিশেষত প্রথম পত্নীকে যে পুরুষ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেন তারই প্রতিফল যেন তাঁকে পেতে হয়েছে নেলী ওয়াজেদের স্বামীকে ত্যাগ করায়। প্রথম পত্নীকে ত্যাগ করার ঘটনাটি আমার কাছে মনে হয়েছে নিষ্ঠুরতা। মুসলমানরা অনেক বিয়ে করে ইচ্ছেমতো তালাক দেয়—এ ধারণাটা যেন অমানবিক হয়ে উঠে আলি সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটায়।

সমগ্র লেখার বেশির ভাগ অংশে শুধু ইসলাম আর আল্লার চিন্তায় মনে হয়েছে আলি একজন গোঁড়া মুসলমান। তিনি মানুষ অপেক্ষা মুসলমানকেই বড়ো বলে মানেন। এমনকী 'তিনি নজরুল ইসলামের কবিতায় হিন্দু-মুসলমান ঐতিহ্য-সমন্বয়ের প্রয়াসে ক্ষুব্ধ।' ভারতবর্ষে বাস করে, ভারতীয় সাধনার সমন্বয়প্রয়াসকে অস্বীকার করে, যিনি আলাদা ধর্মীয় ভাবনার কথা ভাবেন, তাকে মান্য করেন, তাঁর সম্পর্কে এতকালের শ্রদ্ধাবোধটা খানখান হয়ে গেল। এ প্রবন্ধ না পড়লেই ভালো হত। এখন যে যার ধর্মকে বড়ো করার সাধনা চলছে। তাতে সৈয়দ মুজতবা আলির নামও যুক্ত হল।

রঘুনন্দন গুপ্ত
কাঁথি, মেদিনীপুর

প্রবন্ধকারের উত্তর

শ্রীরঘুনন্দন গুপ্ত আমার লেখা "জন্মশতবর্ষে এস. ওয়াজেদ আলি" প্রবন্ধটি পড়ে মর্মাহত হয়েছেন জেনে দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু জীবন বড়ো নিষ্ঠুর, সত্যের সম্মুখীন না হয়ে তাকে ভুলে থাকা বা অস্বীকার করা মিথ্যাচারের নামান্তর। অন্যদিকে জীবনের কোনো ঘটনাকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে সমগ্র মানুষটিকে চেনা বা জানা যায় না। এস. ওয়াজেদ আলির ব্যক্তিগত জীবনের ট্রাজেডির পুরো ইতিহাস আমাদের জানা নেই, ফলে ঘটনার বিবরণটুকুমাত্র দেওয়া সম্ভব,—সেই একটিমাত্র ঘটনার সাহায্যে কারও আচরণ অমানবিক বলা অসংগত।

কিন্তু আমার 'সমগ্র লেখার বেশির ভাগ অংশে শুধু ইসলাম আর আল্লার চিন্তায় মনে হয়েছে আলি একজন গোঁড়া মুসলমান। তিনি মানুষ অপেক্ষা মুসলমানকেই বড়ো বলে মানেন।' —এমন ধারণা হল কী করে? আলি সাহেব ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান হলেও সারাজীবন তিনি 'ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদর্শ' প্রচার করে গেছেন। তিনি যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী, উদারতাবাদী—এই কথা মনে রাখলে তাঁর ধর্মচিন্তার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা সম্ভব হবে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি পরলোক এবং ধর্মে বিশ্বাস করলেও তিনি 'ধর্মের নামে যে শ্মশান-মানসিকতা চলে আসছে তাকে বর্জন'

করতে বলেছেন। তিনি 'আনুষ্ঠানিক ধর্ম' বা 'ধর্মের আপেক্ষিক সত্যকে মূল্য দেন নি। তিনি বারবার বলেছেন 'মুসলমানকে হিন্দু কালচারের সম্মান করতে হবে, হিন্দুকে মোসলেম কালচারেরও সম্মান করতে হবে; আর এই দুই কালচারের মধ্যে যা কিছু মূল্যবান এবং স্থায়ী জিনিস আছে তার কদর উভয়কেই করতে হবে।' তিনি আরও বলেছেন, 'একথা একান্তভাবে সুনিশ্চিত যে, বাংলার সুদিন ততদিন আসবে না, যতদিন এই দুই সম্প্রদায় পরস্পরকে ভালোবাসতে না শিখবে, আর উভয় সম্প্রদায়ের লোক নিজেদের প্রথমত বাঙালি আর তারপর হিন্দু কিংবা মুসলমান হিসাবে ভাবতে না শিখবে।' আসলে প্রত্যেকে নিজের 'আইডেনটিটি' রক্ষা করেও জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হতে পারে—এই বিশ্বাসের প্রকাশ আলি সাহেবের রচনায়।

তবে আমার প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে এস. ওয়াজেদ আলির মানসজীবনে এক ধরনের স্ববিরোধ বা চিন্তাধারার সীমাবদ্ধতার কথাও বলেছি। বলা বাহুল্য, তাঁকে সর্বত্রুটিহীন 'মহামানব' হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। এখন কারও যদি মনে হয় আমার 'এ প্রবন্ধ না পড়লেই ভালো হত'—তাহলে আমি নিরুপায়।

হঠাৎ সৈয়দ মুজতবা আলির নাম যুক্ত হল কেন? তাঁর কথা তো "জন্মশতবর্ষে এস. ওয়াজেদ আলি" প্রবন্ধে বলা হয় নি।

অলোক রায়
কলিকাতা-৩৪

২

"সমাজতন্ত্রের মহিমা"—কিছু প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

"চতুরঙ্গ"র মে ১৯৯১ সংখ্যায় গ্রন্থসমালোচনা অংশে মুদ্রিত বেণু গুহঠাকুরতার আলোচনা থেকে কয়েকটি প্রশ্ন উঠে আসে।

(১) গত দু-আড়াই বছরে মধ্য, পূর্ব আর দক্ষিণ ইয়োরোপের কয়েকটি দেশে যে ভোল-বদল হয়ে গেল, মনে হয়, আলোচকও সেই দেশগুলিকে "সমাজতান্ত্রিক" মনে করতেন। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসের আগে পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই দেশগুলি "জনগণতান্ত্রিক" বলে পরিচায়িত হত (স্তালিনের শেষ পুস্তিকায় [১৯৫২] এগুলি "জনগণতান্ত্রিক" দেশ, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির উনবিংশ কংগ্রেসের রিপোর্টেও [১৯৫২-র শেষভাগ] "জনগণতান্ত্রিক")। ১৯৫৬-র বিংশ কংগ্রেসে সোভিয়েত পার্টিতে ক্রুশ্চভ-মিকোয়ানদের নেতৃত্ব কায়েম হওয়ার পর থেকে এগুলি শুধু "সমাজতান্ত্রিক" দেশ বলেই চিহ্নিত হল না, এদের নিয়ে একটি "সমাজতান্ত্রিক শিবির"ও নাকি গড়ে উঠল। জানতে চাওয়া স্বাভাবিক: দু-তিন বছরের কালসীমায় এইসব দেশের মতাদর্শিক, রাজনীতিক, আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক বিকাশে কী এমন মৌলিক রূপান্তর ঘটে গেল, যা দেখে ক্রুশ্চভ-মিকোয়ানরা এদের প্রায় রাতারাতিই "সমাজতান্ত্রিক" বানিয়ে দিল?

(২) যেসব দেশ ব্রেঝনেভের "সীমিত সার্বভৌমত্বে"র তত্ত্ব (স্বেচ্ছায় বা গুঁতোর চোটে) মেনে নেয়, যেসব দেশ নিজেদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে স্বভূমিতে পরদেশের সৈন্য মোতায়েন থাকতে দেয়, উপরন্তু নিজেদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও জলাঞ্জলি দিয়ে স্বদেশকে পরদেশের কাঁচামালের জোগানদার আর পরদেশের শিল্পপণ্যের বাজারে পরিণত হতে দেয়—সেসব দেশকে সমাজতান্ত্রিক বলতে পারা যাবে? আলোচক কী বলেন? তিনিও কি মনে করছেন—এইসব দেশে "সমাজতন্ত্রের পতন" ঘটে গেছে? নাকি, এক সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে আর-এক (বা একাধিক) সাম্রাজ্যবাদের হাতে এই দেশগুলি চালান হয়ে গেল?

(৩) আলোচক কিছু ত্রৎস্কীয় তত্ত্বের কথা জানিয়েছেন—সেই সময়ের কথা যখন ত্রৎস্কি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির পলিটবুরোতে আছেন। কোনো ব্যক্তি পলিটবুরোতে থাকলেই উচিত কথা, ঐতিহাসিক-বস্তুবাদসম্মত কথা বলবেন—এ কেমন যুক্তি? ইতিহাস দেখাচ্ছে—ত্রৎস্কি, জিনোভিয়েভ-কামেনেভ, বুখারিন—এঁদের প্রত্যেকেরই তাত্ত্বিক অভিমত, পার্টি কংগ্রেসে অগ্রাহ্য হওয়ার পরও পার্টি-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, পার্টির বিভিন্ন স্তরে পুনরায় আলোচিত হওয়ার শেষে, কেন্দ্রীয় কমিটি আর কেন্দ্রীয় কনট্রোল কমিশনের যুক্ত অধিবেশনে যথোচিতভাবে বিতর্কিত হয়েছে, এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। ত্রৎস্কির তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করে সোভিয়েত দেশের মঙ্গল হয়েছে, না অমঙ্গল—সে রায় ইতিহাস দিয়েছে। রায় ত্রৎস্কির পক্ষে যায় নি।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি গুরুতর প্রশ্ন আছে। ধরে নেওয়া গেল: ত্রৎস্কির নীতি বিশ্বসমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুকূল, ত্রৎস্কিবিরোধী বলশেভিক নীতি বিপ্লবের প্রতিবন্ধক। প্রতিবৈপ্লবিক বলশেভিক জমানার বাইরে চলে গিয়ে ত্রৎস্কি সারা পৃথিবীতে তাঁর বৈপ্লবিক নীতি অবাধে প্রয়োগ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ত্রৎস্কি আর তাঁর চতুর্থ আন্তর্জাতিক কিভাবে সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন? "চিরন্তন" বিপ্লবের বিকাশে কী ভূমিকা পালন করেছিলেন?

(৪) প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে জারের রাশিয়া ছাড়াও ইয়োরোপের আরও কিছু দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুকূল অবস্থা ছিল। বস্তুত, হাঙ্গেরিতে আর জার্মানিতে বিপ্লব শুরুও হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারে না। বলশেভিক নেতারা প্রত্যাশা করেছিলেন—যেটা সম্ভাবনা, সেটা মূর্ত সত্য হবে। হয় নি। মানুষের ইতিহাসে এমন ঘটনা বহু ঘটেছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে—বিপ্লবের বিষয়গত উপাদানগুলি পরিপক্ক হয়ে থাকলেও, বিষয়গত উপাদানের (নেতৃত্বের) অপরিণত অপ্রস্তুত অবস্থার জন্য বিপ্লব পরাস্ত হতে পারে, হয়, হবে।

এইসব কথা বলে বলশেভিক নেতাদের বিদ্রূপ করার ('বিপ্লব হল বলে'), তাঁদের বালখিল্যতা দেখানোর জন্য ডোরা রাসেলের কথা শোনানোর কোনো অর্থ হয়?

(৫) বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের সংকটহীন স্থিতিশীলতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য স্তালিন ১৯৫২ সালে তাঁর শেষ পুস্তিকায় করেছিলেন। মন্তব্য করার সময়ে স্তালিন এ কথা বলেন নি যে, অতঃপর যত দিন সাম্রাজ্যবাদ সমাজে টিকে থাকবে, তত দিন তাঁর ওই মন্তব্যের সঠিকতা বহাল থাকবে।

বস্তুত, ১৯৭০ সালের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ সংকটের আবর্তের মধ্যেই ছিল। তার পর বছর দশ-পনেরো সে হয়তো সাময়িকভাবে হলেও কতকটা সামাল দিতে পারে। কিন্তু আবার যে সে আরো বড়ো সংকটে পড়বে না, তার নিশ্চয়তা কী? সাম্রাজ্যবাদের নিজের-নিজের দেশে এবং তার শোষণাধীন তৃতীয় বিশ্বে আবার যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের জোয়ার উঠবে না—একথা কি আমরা স্থিরনিশ্চিতভাবে জেনে বসে আছি?

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আছে। উনবিংশ কংগ্রেসে সোভিয়েত পার্টি আন্তর্জাতিক আর আভ্যন্তরিক পরিসরে যেসব নীতি নির্ধারণ করে, বিংশ কংগ্রেসে ক্রুশ্চভ-মিকোয়ানের দলবল সেসব পুরোপুরি নাকচ করে দেয়। এ ঘটনা যদি না ঘটত? উনবিংশ কংগ্রেসের লাইন যদি জারি থাকত? তাহলে কী হত? একটা বস্তুর বা প্রক্রিয়ার অন্তর্দ্বন্দ্ব তার ভিতর থেকেই ওঠে। কিন্তু বাইরের প্রভাব সেই দ্বন্দ্বকে যেমন ত্বরান্বিত করতে পারে, তেমনি মন্দীভূতও করতে পারে। উনবিংশ কংগ্রেসের বলশেভিক নীতি ছিল ত্বরণগুণসম্পন্ন। বিংশ কংগ্রেসের মেনশেভিক নীতি মন্দনগুণসম্পন্ন।

লেনিন প্রায় সত্তর বছর আগে বলেছিলেন, সাম্রাজ্যতন্ত্র ধনতন্ত্রের মুমূর্ষু অবস্থা। যাঁরা এই কথাকে দশ-বিশ-পঞ্চাশ বা আশি-নব্বই-একশ বছরের কাল-পরিমাপে বিচার করবেন (কোনো বস্তুবাদী-ঐতিহাসিকই তা করবেন না), তাঁরা লেনিনকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে দিতে পারেন। করেনও। কিন্তু সাম্রাজ্য-বাদের মুমূর্ষুতা মিথ্যা হয় নি।

দিবাকর চৌধুরী
হাওড়া-১

৩

প্রসঙ্গ : রামমোহনের মূল্যায়ন

প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়কে, এবং সাথে-সাথে "চতুরঙ্গ"-সম্পাদককেও, ফেব্রুয়ারি '৯১ সংখ্যায় একটি 'প্রেরণাসঞ্চারকারী' সমালোচনা প্রকাশ করার জন্য। 'প্রেরণাসঞ্চারকারী' বলছি এজন্যই যে "চতুরঙ্গে" এত দীর্ঘ এবং এত বেশি আক্রমণাত্মক গ্রন্থসমালোচনা এর আগে পড়েছি বলে মনে পড়ে না। তাই কৌতূহলবশত মূল গ্রন্থটিও, পড়া না থাকায়, পড়ে ফেললাম। নিজে পণ্ডিত বা গবেষক কোনো কিছু না হয়েও, "চতুরঙ্গের" একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে এ প্রসঙ্গে কয়েকটি বক্তব্য উপস্থাপিত না করে পারছি না।

গ্রন্থকার দীপংকর চক্রবর্তী "বাংলার রেনেসাঁস : মূল্যায়ন ও ফলাফল" গ্রন্থের উপসংহারে বলেছেন : 'তাহলে আমাদের সামগ্রিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থ-নৈতিক-সামাজিক পটভূমিকায় মুখ্য ও প্রাথমিক তথা মৌলিক দায়িত্ব ছিল বিদেশী শাসনের বিরোধিতা করা, ব্রিটিশ-সৃষ্ট ভূমি-ব্যবস্থার বিরোধিতা করা, ধর্ম-নিরপেক্ষ সাম্প্রদায়িক ঐক্যের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করা। রেনেসাঁস- নায়কেরা এই মৌলিক দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হবার ফলে, যুক্তিবাদী বিশ্লেষণের ধারা, ব্যক্তি-সত্তার স্বীকৃতি ও বিকাশ, জাতীয় সংহতির ধারণা, আন্তর্জাতিকতার চেতনা, বিজ্ঞানশিক্ষার প্রয়োজনীয়-তার উপলব্ধি প্রভৃতি যে-সমস্ত ইতিবাচক সম্ভাবনা তাঁদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সূচিত হয়েছিল, সঠিক ভিত্তির ওপরে সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ফলত, সেই ইতিবাচক সম্ভাবনাগুলির সার্বিক বিকাশ তো ঘটেই নি, উপরন্তু সে সম্পর্কে সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতার মানসিকতাকে প্রত্যাখ্যান করে সঠিক ও বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যায়ন গড়ে তুলতে না পারার ফলে সেগুলির খণ্ডিত-খর্বিত-বিকৃত রূপই ধারাবাহিকভাবে এখনো পর্যন্ত প্রাধান্য বিস্তার করে রয়েছে এবং আমাদের দেশের পূর্বতন ও বর্তমান শাসকশ্রেণীগুলির মৌলিক স্বার্থে গড়ে তোলা 'জাতীয় চেতনা'-র মূল ভিত্তি ও সূচনাবিন্দু হিসেবে কাজ করে চলেছে। তাই রেনেসাঁসের সেই মৌলিক বিচ্যুতিগুলির এবং সেগুলির অন্তর্নিহিত ঔপনিবেশিক মানসিকতার যথোপযুক্ত মূল্যায়ন ও উপলব্ধির ভিত্তিতে আমরা যদি সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে তার বিপরীতে প্রকৃত মুক্তিকামী মানসিকতা ও অবস্থানগুলিকে চিহ্নিত ও উপলব্ধি করতে পারি, এবং যেটা আমাদের করতেই হবে, তাহলে কেবলমাত্র তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পারব রেনেসাঁসের যদিও গৌণ, কিন্তু ইতিবাচক সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তবতার নিরিখে শুধরে নিতে, ও আত্মস্থ করতে, সেগুলিকে সমাজপরিবর্তনের পটভূমিকায় স্ব-মহিমায় প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠিত করতে' (পৃ ৫৫-৫৬)।

আবার, গ্রন্থের 'প্রসঙ্গ : রামমোহন' অধ্যায়ের উপসংহারে গ্রন্থকার বলেছেন : 'উপসংহারে বলা যায়, উনিশ শতকের প্রথম প্রহরে সেই কুসংস্কার-ধর্মীয় সংকীর্ণতা-ভাগ্যসর্বস্বতা-আচ্ছন্ন অন্ধকার যুগে পাশ্চাত্য আধুনিক ভাবধারার আলোকে এদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আধুনিক ধ্যানধারণার বিকাশ ঘটাতে গিয়ে নিঃসন্দেহে প্রচণ্ড দৃঢ়তা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন রামমোহন। এদেশে শাসনব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, রাজস্বব্যবস্থা প্রভৃতি প্রশ্নেও তিনি সূচনা করেছিলেন এক যুক্তিবাদী ধারার। কিন্তু সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি পরিচালিত হয়েছিলেন মূলত সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থে, শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসার কোন মৌলিক প্রবণতা তাঁর মধ্যে দেখা যায় নি, এমনকি মেলে নি এই গণ্ডি ভাঙার প্রচেষ্টাজাত কোনোরকম দ্বন্দ্ব-যন্ত্রণারও ইঙ্গিত। বরং বয়সোচিত পরিণতি তাঁকে ক্রমশ বেশি গণ্ডবদ্ধ করে তুলেছে, স্পষ্ট ধরা পড়েছে বহু মৌলিক প্রশ্নেও এক দুঃখজনক পশ্চাদপসরণের। ফলত সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতার পথিকৃৎ এবং এর শ্রেণীগত গণ্ডির মধ্যে আপাদমস্তক আবদ্ধ রামমোহনের বিভিন্ন অনন্যসাধারণ গুণাবলীও মূলত ভাবগত ও বস্তুগত অর্থে নিতে পারে নি এমন কোন ইতিবাচক ভূমিকা, যা পরবর্তী কালে সমাজ-পরিবর্তনকামী চেতনার প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে' (পৃ ৭৯)।

অথচ শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর সমালোচনার শুরুতেই (পৃ ৮২১) এই দুটি অধ্যায়ের 'বক্তব্যসার' হিসেবে মূলগ্রন্থ থেকে যেসব বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাতে গ্রন্থকারের বক্তব্য একপেশে ও বিকৃতভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রন্থকারের ওপরে উদ্ধৃত মূল সিদ্ধান্তকে সমালোচক এভাবে এড়িয়ে গেলেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর মেলে না। তাই প্রশ্ন জাগে : সমালোচক কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এ কাজটি করেছেন?

এই প্রশ্নটি অনেক বেশি সোচ্চার হয়ে ওঠে অন্য একটি কারণেও। মূলগ্রন্থে গ্রন্থকার "ভূমিকার বদলে" শীর্ষক উপক্রমণিকায় তাঁর এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য বিবৃত করেছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, সমাজ-পরিবর্তনের প্রয়োজনেই আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদ তথা শোষকশ্রেণীগুলির স্বার্থবাহী ভুয়া ইতিহাস-চেতনার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে ও তাকে প্রত্যাখ্যান করে, এক কথায় 'মানসিক ও সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতা'র অবসান ঘটিয়ে, বিকল্প-দৃষ্টিভঙ্গি-ভিত্তিক মূল্যায়নের একটি প্রচেষ্টা হিসেবেই এই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। সমালোচক তাঁর চোদ্দ পৃষ্ঠার দীর্ঘ আলোচনায় এই ঘোষিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি বাক্যও ব্যয় করেন নি! অনিবার্য প্রশ্ন জাগে : কেন?

শুধু তাই নয়। গ্রন্থকার 'ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনের প্রতি এবং তার বিরুদ্ধে পরিচালিত কৃষক-সংগ্রামগুলির প্রতি অনুসৃত দৃষ্টিভঙ্গিকেই' বাঙলার রেনেসাঁসের মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন (পৃ ২৫), তত্ত্ব-তথ্য-বিতর্ক-সহযোগে। সমালোচক এই প্রশ্নটিকেও মূলত হয় এড়িয়ে গেছেন, না হয় একে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করেছেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রসঙ্গে মার্কসের 'উজ্জীবন'তত্ত্ব বা 'ধ্বংসাত্মক'তত্ত্বের মধ্যে কোনো একটি 'মানা বা না মানা' তাঁর মতে তাই 'রাজনৈতিক রুচির ব্যাপার'। দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকার প্রেক্ষিতে বিচার-বিবেচনা প্রসঙ্গে ভারতে ঔপনিবেশিক পটভূমিকায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার মানদণ্ডকে তিনি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধিতার মানদণ্ডের থেকে বিচ্ছিন্ন হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন (পৃ. ৮২২)। তৃতীয় বিশ্বের সমাজ-অর্থনীতিতে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ যে হাত-ধরাধরি করে চলে, এই সর্বজন-স্বীকৃত তত্ত্বটি কি প্রাজ্ঞ সমালোচকের অজানা? এই-ভাবে বিচারের মানদণ্ডের প্রসঙ্গটিকে এড়িয়ে গিয়েও একেবারে শেষে তিনি দাবি করছেন, গ্রন্থকারের গৃহীত মানদণ্ডে কী পরিমাণ বিভ্রান্তি আছে তিনি নাকি তা দেখিয়েছেন! (পৃ ৮৩৩) আবার পরমুহূর্তেই তিনি স্বীকার করেছেন, মার্কসবাদের বিভিন্ন স্তর থেকে ব্যবহৃত বিভিন্ন মাপকাঠির মধ্যে কোন্‌টি ঠিক কোন্‌টি ভুল, তা নির্ণেয় নয়! অর্থাৎ, বাস্তবতই গ্রন্থকারের মূল্যায়ন মডেলের প্রাথমিক ভিত্তি সম্পর্কে বিচার-বিবেচনার দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে সমালোচক গ্রন্থ-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এটাকে অবশ্যই বলা যায়, সমালোচকের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গি, যা

গ্রন্থকার-বর্ণিত 'মানসিক ও সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতা'র অনিবার্য পরিণতি।

সমালোচক তাহলে কিসের সমালোচনা করলেন চোদ্দ পৃষ্ঠা জুড়ে! একটা উপমা দিলে বোধহয় বোঝাতে সুবিধে হবে। গ্রন্থকার বাঙলার রেনেসাঁস ও রামমোহনের মূল্যায়নমূলক একটি কাঠামো তৈরি করতে প্রয়াসী হয়েছেন তাঁর গ্রন্থের মাধ্যমে। সমালোচক সেই কাঠামোর ভিত মজবুত না দুর্বল, সেই মূল প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে তার বাহ্যিক ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়েই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকলেন। নির্মীয়মাণ বাড়ির ভিত নিয়ে তাঁর আদৌ মাথাব্যথা নেই, যত মাথাব্যথা তার প্লাস্টারিঙ রঙ ইত্যাদি বহিরঙ্গের ব্যাপারগুলি নিয়ে। ঠিক যেমন 'শ্রীকান্তে'র নতুনদা প্রচণ্ড শীত আর কাদার কষ্টের চেয়েও হারানো একপাটি জুতোর শোকেই বেশি কাতর হয়েছিলেন।

সমালোচক ইউরোপীয় রেনেসাঁসের চরিত্রবৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে তাঁর 'পাহাড়প্রমাণ' জ্ঞান জাহির করতে সচেষ্ট হয়েছেন। ইউরোপীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে গ্রন্থকার গ্রহণ করেছেন এ. এফ. মার্টিনের ভাষ্য: 'The typological importance of the Renaissance is that it marks the first cultural and social breach between the Middle Ages and modern times: it is a typical early age of modern age'. (*Sociology of the Renaissance*)। এ প্রসঙ্গে এঙ্গেলসও বলেছেন: রেনেসাঁস 'took root more and more and prepared the way for the materialism of the eighteenth century'. (*Dialectics of Nature*)। আসলে কোনো-কোনো স্থানে তথ্যগতভাবে সমালোচক অপেক্ষাকৃত জোরালো অবস্থানে থাকলেও গ্রন্থকারের সঙ্গে তাঁর বিতর্কের মূল জায়গাটা সেই দৃষ্টিভঙ্গিকে ঘিরেই—গ্রন্থকার জোর দিয়েছেন সমাজবিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে রেনেসাঁসের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণের ওপর, সমালোচক সেই প্রেক্ষিতটিকেই আদৌ গুরুত্ব দেন নি। বাঙলার রেনেসাঁসকে সমাজবিকাশের প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেই গ্রন্থকার দেখিয়েছেন যে, উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার বা ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামোয় মৌলিক গুণগত পরিবর্তনের অনুপস্থিতিতে তার মধ্যে সামাজিক প্রগতির কোনো ইঙ্গিত প্রকৃতপক্ষে নিহিত ছিল না, এবং সে কারণেই তা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে আরোপিত, বহিরঙ্গে কিছু আলোড়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সমালোচক গ্রন্থকার-বর্ণিত ইউরোপীয় রেনেসাঁসের চরিত্রবৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রশ্ন তুললেও গ্রন্থকারের এই সিদ্ধান্তকে ভুল প্রতিপন্ন করতে পারেন নি। আর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার 'অপরাধে' গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত তাঁর সুতীক্ষ্ণ তীরগুলি যে অন্তত এই প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ (যিনি শেষ পর্যন্ত রেনেসাঁসকে বলেছেন 'বিরাট এক ঐতিহাসিক ধাপ্পা'), বরুণ দে (যিনি একে বলেছেন 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মদতে সৃষ্ট'), সুমিত সরকার ('বুর্জোয়া আধুনিকতার এক দুর্বল ও বিকৃত প্রহসন'), অরবিন্দ পোদ্দার ('বোধবুদ্ধি মনন চিন্তা কল্পনার আত্মক্ষয়ী সর্বগ্রাসী দাসত্বের নজির') প্রমুখেরও গায়ে গিয়ে বেঁধে, তা সমালোচক সুকৌশলে চেপে গেছেন।

গ্রন্থকার বাঙলার রেনেসাঁস সম্পর্কে সুশোভন সরকারের ত্রিসূত্রিক সংযোজনীর যে বিশ্লেষণ করেছেন, সমালোচক তাকে ভাসা-ভাসাভাবে ছুঁয়ে গেছেন—মূল ওই তিনটি সূত্র সম্পর্কে তাঁর অবস্থান কী, তা আদৌ স্পষ্টভাবে জানান নি। ফলে, ভারতীয় সমাজজীবনের দুর্গতির মূলে বদরুদ্দীন উমর-কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে এবং গ্রন্থকার-কর্তৃক রেনেসাঁসকে গুরুত্ব প্রদান যে একই বিষয়ের দুটি দিক, তা প্রাজ্ঞ সমালোচকের উপলব্ধিতে ধরা পড়ে নি। একইভাবে গ্রন্থকার প্রাচ্যবাদী ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসন ও ভূমিব্যবস্থা-নির্ভরতার ক্ষেত্রে যে মৌলিক শ্রেণীগত অভিন্নতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সমালোচক শ্রেণী-বিশ্লেষণমূলক আলোচনার প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত অনীহার কারণে তা ঠিকমতো উপলব্ধি করতে না পেরে উলটে স্থূলরুচির রসিকতা করেছেন যা কোনো বিদগ্ধ ব্যক্তিকে শোভা পায় না।

রামমোহন প্রসঙ্গে আলোচনাতেও সমালোচক মূল বিষয় সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে কতকগুলি তথ্যগত খুঁটিনাটির ওপর মূল জোর দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি গ্রন্থকারের চেয়ে আপেক্ষিকভাবে বেশি তথ্যের উপস্থাপনা করলেও তাঁর উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। কার্যত, বহুক্ষেত্রেই সমালোচক অনেকগুলি অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করেছেন। যেমন, গ্রন্থকার রামমোহনের ভোগবিলাস ও শ্রেণী-অবস্থানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও ইউরোপের রেনেসাঁস-নায়কদের কোনো প্রসঙ্গ আনেন নি এ সম্পর্কে, অথচ সমালোচক এ নিয়ে গ্রন্থকারকে একহাত নিয়েছেন। সতীদাহবিরোধিতার ক্ষেত্রে গ্রন্থকার রামমোহনকে 'পথিকৃৎ' এবং 'আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চার' করেছেন বলে মনে করেছেন, অথচ সমালোচক সে-কথা চেপে গিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে 'ইচ্ছাকৃত অসততা'র অভিযোগ এনেছেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নীলকরদের সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি, রায়তদের সম্পর্কে আবেদন প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থকার রামমোহনের অবস্থানকে তাঁর শ্রেণী-অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে সিদ্ধান্ত টেনেছেন, আর এ-সমস্ত ক্ষেত্রেই সমালোচক মূল প্রশ্নগুলি এড়িয়ে গিয়ে অন্য বিষয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। বস্তুত, সমালোচক রামমোহনের শ্রেণী-অবস্থানগত কোনো আলোচনাকেই বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিতে রাজি হন নি। ফলে, গ্রন্থকারের মৌলিক অবস্থান ঠিক না ভুল—সে সম্পর্কে কোনোরকম সিদ্ধান্ত তিনি হাজির করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

গ্রন্থকারকে অসৎ বা ভুল প্রতিপন্ন করার তাড়নায় সমালোচক নিজেই অন্তত দুটি ক্ষেত্রে প্রগতিশীল চেতনা বা সততার পরিচয় দেন নি। 'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পথিকৃৎ' হিসেবে বিজ্ঞাপিত রামমোহনের মধ্যে প্রকৃত জাতীয়তাবাদী চেতনার বীজ ছিল কিনা—এ প্রশ্নের বিচারেই তাঁর ঘোর আপত্তি। আর রামমোহনের জাতীয়তাবাদে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার উপাদান না পেয়ে গ্রন্থকার যে সমালোচনামুখর হয়েছেন—তাতেও তাঁর প্রবল আপত্তি। অথচ এমন কোনো তথ্য-প্রমাণ তিনি হাজির করতে পারেন নি যাতে গ্রন্থকারের অভিযোগ বা সমালোচনাকে ভুল বলে চিহ্নিত করা যায়। ফলে, সমালোচক কার্যত সাম্রাজ্যবাদনির্ভর ভারতের বিকৃত জাতীয়তাবাদের একজন উত্তরাধিকারী হিসেবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। দ্বিতীয়ত, কুৎসিত দ্বিজাতি-তত্ত্বের প্রাথমিক ইঙ্গিত বাঙলার রেনেসাঁস-নায়কদের মধ্যেই ছিল—গ্রন্থকারের এই অভিযোগ খণ্ডন করতে গিয়ে সমালোচক স্পষ্টত অসততার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি 'Appeal to the King in the Council'-এর ৪৩নং অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু Appeal-এর ৩নং অনুচ্ছেদেই রামমোহন হিন্দুদেরকে এদেশের 'মূল অধিবাসী' বলে চিহ্নিত করেছেন, এবং মুসলিমদের বিদেশী ও মুসলিম শাসনকে বিদেশী শাসন বলে পৃথকীকরণ করে ভগবৎকৃপায় ব্রিটিশ-কর্তৃক সেই অত্যাচারী বিদেশী শাসন উৎখাতের জন্য ব্রিটিশকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। সমালোচক সচেতনভাবেই এ তথ্যটি চেপে গিয়েছেন! হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দেশী ও বিদেশী বলে এই বিভেদসৃষ্টি তো আজ হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রচারের সূচনাবিন্দু। সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলেই কি গ্রন্থকার অমার্জনীয়ভাবে অপরাধী?

শালীনতা আর রুচির প্রশ্ন

গ্রন্থকার কখনোই তাঁর রচনাকে মৌলিক গবেষণাগ্রন্থ বলে দাবি করেননি, বরং প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি

তাঁর তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছেন। সমালোচক গ্রন্থকারের সেই তথ্যসূত্রগুলির দিকে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে গ্রন্থকারের 'অমৌলিকত্বে'র ওপর জোর দিতে চেয়েছেন—অথচ নিজেই তিনি, স্বাভাবিকভাবেই, অনেক তথ্যসূত্রের সাহায্য নিয়েছেন। এই দ্বিবিধ আচরণ অবশ্যই খুব শালীনতার পরিচয় বহন করে না। সমালোচক আবার গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এনেছেন যে, গ্রন্থকার অমুক ব্যক্তির অমুক বক্তব্য আংশিকভাবে মেনেছেন, পুরোটা মানেন নি। কে কার বক্তব্য কতটা গ্রহণ করবেন, তাও আজকাল সমালোচকের মর্জির ওপর নির্ভর করে নাকি?

সমালোচক তাঁর সমালোচনার শুরুতেই বলেছেন, গ্রন্থটি রচিত 'উহ্য রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং স্বীকৃত অরবিন্দ পোদ্দারের অভিভাবকত্ব মেনে'। প্রথমত, এরকম পরম জ্ঞানের কথা খুব সুরুচির পরিচয় দেয় না। দ্বিতীয়ত, রমেশ মজুমদারের কোনো-কোনো বক্তব্য গ্রন্থকার আংশিকভাবে গ্রহণ করলেও, মূল দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে তাঁদের দুজনের যে আকাশ-পাতাল তফাত, সেটা সমালোচক হয় সুবিধেজনকভাবে এড়িয়ে গেছেন, না হয় বুঝতে পারেন নি। তৃতীয়ত, শুধু অরবিন্দ পোদ্দার নন,—বদরুদ্দীন উমর, বরুণ দে, সুমিত সরকার, সুপ্রকাশ রায় প্রভৃতি অনেকের বক্তব্যই গ্রন্থকার কম-বেশি গ্রহণ করেছেন—সে কথা সমালোচক স্বীকারও করেছেন বিভিন্ন পৃষ্ঠায়। তাহলে এই অন্তঃসারশূন্য পণ্ডিতী মন্তব্যের যুক্তি কোথায়?

গ্রন্থকার কী বলবেন জানি না, তবে সমালোচকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কেউ যদি উহ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও স্বীকৃত ভারতীয় শাসকশ্রেণীর ভাড়াটে ঐতিহাসিকদের অভিভাবকত্ব মেনে সমালোচক এই গ্রন্থসমালোচনা সম্পন্ন করেছেন বলে অভিযোগ তোলেন, সমালোচক তার জবাবে কী বলবেন জানতে ইচ্ছে করে!

অবশেষে, আমার মনে হয়, গ্রন্থকারের প্রকৃত উদ্দেশ্যটি বাস্তবত সিদ্ধ হয়েছে। 'মানসিক ও সাংস্কৃতিক ঔপনিবেশিকতার অবসান' তাঁর গ্রন্থের ঘোষিত উদ্দেশ্য। সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত, শ্রেণী-অবস্থান প্রভৃতির প্রশ্ন সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে গ্রন্থকারের বিরুদ্ধে উন্মত্তভাবে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে সমালোচক প্রমাণ করেছেন গ্রন্থকার-নিক্ষিপ্ত তীরটি ঠিক জায়গাটিতেই বিদ্ধ হয়েছে।

নরেন সরকার
কলিকাতা-১২

অনিবার্য কারণে সমালোচকের প্রত্যুত্তর জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদক

মে সংখ্যায় কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদের সংশোধন

পৃষ্ঠা	কলম/লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭২	১/৩২	১৫,৫০০০	১৫,৫০০
	২/২৬	হল	হলে
৭৩	২	উদ্ধৃতিটি ট্রটস্কির *Towards Socialism or Capitalism* গ্রন্থ থেকে গৃহীত	
৭৪	১/১১	capitalist	socialist
	২/১৭	আন্তর্জাতিকতা	আন্তর্জাতিক
৭৫	১/১২	landed	handed
		foilers	toilers